

[illegible]



দেবদাস পাঠক

প্রথম প্রকাশ—
১লা বৈশাখ, ১৩৬৩

প্রকাশক—
নারায়ণ সেনগুপ্ত
ক্লাসিক প্রেস
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদশিল্পী—
সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক—
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্তিস্থান—
বইঘর
কিরিঙি বাজার, চট্টগ্রাম

দাম দু'টাকা

মাকে—

গল্পক্রম

স্মৃতিচিহ্নলক	৯
বৃত্ত	২৩
ছায়াপথ	৩৭
হিসাব	৫০
অভিজ্ঞান	৬২
প্রয়োজন	৭৫
জাতক	৮৬
চোরকাটা	৯৫
শবরী	১০৩

শ্রীদেবদাস পাঠকের প্রথম গল্পগ্রন্থকে সাধারণ্যে প্রকাশিত করবার সুযোগ পেয়ে আমরা গর্বিত। সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের আসরে দেবদাসবাবু একজন প্রতিশ্রুতিশীল লেখনী। পাঠক হিসেবে ওঁর পরিচয় সাধারণের জানবার কথা নয়, কিন্তু ওঁর কথকতার শক্তিকে শুধু 'প্রতিশ্রুতিশীল' এই ধূসর অভিধার অনিশ্চয়তায় বেঁধে রাখা দেবদাসবাবুর সাহিত্যকর্মের প্রতি সুবিচার হয় না। স্বকীয় বিশিষ্টতায় তিনি ইতিমধ্যেই বাংলা কথাসাহিত্যে নিজের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট করেছেন।

তাঁর সংবেদনশীল মন তাঁর প্রতিটি কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। পাঠক-ধাঁধানো উগ্র চমকের তীক্ষ্ণতায় কিস্তিমাত করবার সচেতন চেষ্টা নেই কোথাও। অনুভূতির কোমল আমেজে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল তাঁর কাহিনীগুলি—কখনো কখনো গীতিকবিতার মধুর রেশ রেখে যায় মনে। বৈচিত্র্যের খাতিরে তিনি উদ্ভট, অবাস্তব কিংবা অচেনা কোনো কৃত্রিম পরিবেশের আশ্রয় নেননি। মধ্যবিত্ত সমাজের পারিপাশ্বিকের অতিচেনা প্রতিদিনের স্বাভাবিক ঘটনাবলির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন কাহিনীনির্মাণের আবেগ কেন্দ্র। আর তাঁর আড়ম্বরহীন আন্তরিকতার প্রসাদে তাঁর প্রতিটি রচনাই শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ কাহিনীর এই সহজ আবেগ তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ পাঠকের মনেও। এবং আপন শিল্পদক্ষতার গুণে নিজের চলাপথে তিনি দ্বিতীয়বার পা বাড়ান নি। মূলতঃ সহানুভূতিশীল তাঁর মন। তাই তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিও, (যেন একান্ত আপন যা'রা তা'দের কথাই তিনি বলেছেন) গল্প এগিয়ে চলবার সাথে সাথে অজান্তে কখন নিকট আত্মীয় হয়ে উঠেছে পাঠকদেরও, যেন মনের ভুলে এদের সঙ্গে এতোকাল যোগাযোগ না রাখাটা তাঁদের নিতান্তই একটা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি। লেখকের মমতার নৈপুণ্যে কাহিনীর সংগঠনে পাঠকমনের এই অনিবার্য সহযোগিতা প্রতিটি গল্পকেই রমণীয় করে তুলেছে।

দেবদাসবাবুর লেখার সঙ্গে যাঁ'রা পরিচিত, এবং সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যের আগ্রহী পাঠকদের অধিকাংশেরই সে পরিচয় আছে, তাঁদের কাছে এ-পরিচিতি বাহুল্য। এ শুধু আমাদেরই ভূমিকা। এ-গ্রন্থের যথার্থ মূল্যায়নের দায়িত্ব পাঠকসাধারণের।

—প্রকাশক

সাঁওতাল পরগণার এই নিভৃত শহরটিকে প্রথমবারেই আমি ভালোবেসে ফেলেছি। কলকাতার নির্লজ্জ বেহায়াপনায় যখন অতিষ্ঠ হই তখনই পালিয়ে আসি এই নির্জন ছোট শহরে। শহরের গা ছুঁয়ে জল-তির-তির পাহাড়ী নদী। একূল-ওকূল ত্ব'কূল জুড়ে বালি, মাঝখানে সরু জলের রেখা। আর আছে শহরশেষে নদীর বাঁকে ছোট শালবন। বন বললে সম্মান দেখান হয়, বলা উচিত বাগান। সব মিলিয়ে শ' তিনেক শালগাছ। কোন বড়লোকের শখের সৃষ্টি। বাগান শেষে খানিকটা খোয়াই ভেঙে গেলে শ্মশান। সারা শহরের মধ্যে শালবাগানটিই আমার সবচেয়ে প্রিয়। সন্ধ্যাবেলায় এখানে কোন অবাঞ্ছিত আগন্তুক আসবে না। দূরে গ্রামের আড়ালে সূর্য যখন অস্ত যাবে মেঘের গায়ে তার রঙ অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে মেলাবে। শহরে অভ্র কাটার কাজ শেষ করে নদী পেরিয়ে মেয়ে-পুরুষ গ্রামের পথে ফিরে যায়। পা দিয়ে জল ছিটোয়। ওপারের শুকনো বালিতে খানিকক্ষণ পায়ের ছাপ থাকে—তারপর সন্ধ্যা হবার আগেই সে দাগ মিলিয়ে যায়।

প্রায় বছর ত্বই পর এবার এসে একটি নতুন জিনিস চোখে পড়ল। শ্মশানের এক ধারে একটি স্মৃতি-ফলক। এ-শ্মশানে এই প্রথম। কাজেই কৌতূহল হ'ল। খোয়াই ভেঙে শ্মশানের দিকে নেমে গেলাম। ইঁট দিয়ে গাঁথা বেদীর ওপর শ্বেতপাথরের ফলক, গায়ে লেখা—'মালতী মিত্র, মৃত্যু—১৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৯।' বেদীর পাশে কাঁকরের ওপর কিছু শুকনো ফুল ছড়ান। খুব পুরনো নয়। হয়তো কালই কেউ দিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, কাল যে ফুল দিয়ে গেছে সে তো আজও আসতে পারে। যদি আসে আর আমাকে দেখে! মনে হলো বুঝি মন্দিরে অনধিকার প্রবেশ করেছি। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে আমার পাথরের ঢিবিটার ওপর বসলাম।

তার একটু পরেই দেখলাম, শালবাগান পেরিয়ে এদিকেই কে আসছে। শালবন ছাড়িয়ে সে খোয়াই ভেঙে শ্মশানের দিকে নেমে গেল।

তখন মসলিনের মত হাল্কা অন্ধকার নেমেছে। আবছা আলোয় দেখলাম, লোকটি বেদীর পাশে নীচু হয়ে হাত থেকে কি রাখল। নিশ্চয়ই ফুল। তারপর বেদীর এক পাশে বসল। আস্তে আস্তে রাত নিস্তব্ধ হলো।

প্যাকেটের শেষ সিগারেটটি ফুরোতে উঠে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক তখনও বসে। হয়তো আমার অস্তিত্ব লক্ষ্যই করেননি।

বাড়ি ফিরে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, মালতী মিত্রের কথা আর অজ্ঞাত সেই ভদ্রলোকের। ওরা বলতে পারল না। শুধু বলল, এখানকার লোক নয়। চেঞ্জে এসেছিল বোধ হয় বাইরে থেকে।

পরের দিন আবার দেখলাম ভদ্রলোককে। পাশ দিয়ে যাবার সময় আমার দিকে চেয়ে একটু থমকে দাঁড়ালেন, তারপর খোয়াই ভেঙে নেমে গেলেন।

আরও দু'দিন গেল। দুজনের উপস্থিতি সম্বন্ধে আমরা দু'জনেই সচেতন, অথচ কেউ কাউকে চিনি না। আমার কৌতূহল অদম্য হ'লেও আলাপের তো কোন সূত্র নেই।

কিন্তু আলাপ হ'লো তার পরের দিন এবং আপনা থেকেই। শালবনে যাবার দু'টি রাস্তা। একটি এসেছে শহরের এক প্রান্ত থেকে প্রায় নদী ছুঁয়ে ছুঁয়ে। আর একটি কাছারিপাড়া থেকে শহরের বুক চিরে। দু'টি রাস্তা মিলে এক হয়েছে প্রায় শালবনের কাছে এসে। এখানেই একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেল। উনি আসছিলেন বাজারের রাস্তা দিয়ে, আর আমি অন্য রাস্তায়। মুখোমুখি হতে দু'জনেই এক সঙ্গে হাত তুলে নমস্কার করলাম। হাত তুলতে ওঁর দ্বিধা আমার নজরে পড়ল, হয়তো আমার দ্বিধাও ওর নজরে পড়ে থাকবে। হাত তুলবার আগের মুহূর্তেও ভাবিনি যে, হাত তুলব। আপনা থেকেই হয়ে গেল। রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামলাম। খানিকটা পাথুরে মাটি পেরিয়েই শালবনের শুরু।

শালবনে ঢুকবার পথে উনিই কথা বললেন, আপনাকে এখানে নতুন দেখছি, বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

হ্যাঁ, ছুটি পেলেই আসি। এ জায়গাটা বড় ভালো লাগে।

আমারও, বললেন উনি। চাপা নিঃশ্বাস ফেললেন, কান এড়াল না। এতদিন ধ'রে রোজই দেখছি আপনাকে। আলাপের ইচ্ছা থাকলেও সাহস পাইনি, বললাম আমি।

আমিও তাই ভেবেছি। হয়তো বিরক্ত হবেন তাই এগুইনি।

আশ্চর্য।

সত্যিই আশ্চর্য। আমার কথার পুনরুক্তি শুনলাম ওর মুখে।

ততক্ষণে আমরা শালবনের ধারে এসে পড়েছি। হাতের ফুলগুলির দিকে চেয়ে একটু দ্বিধা করলেন ভদ্রলোক। আমি বিব্রত বোধ করলাম। বললাম, আমি এখানে বসছি। আপনি ফুল দিয়ে আসুন। চেনা টিবিটার ওপর বসে একটা সিগারেট ধরালাম। উনি খোয়াই পেরিয়ে নেমে গেলেন শ্মশানের দিকে। একটু পরেই ফুল দিয়ে ফিরে এলেন আমার কাছে। পাশেই বসলেন।

টিন থেকে সিগেরেট বের করে বললাম, নিন।

না, ধন্যবাদ। সিগারেট আমি খাই না।

দু'জনে পাশাপাশি বসে অনেকক্ষণ কাটালাম।

পরদিন আবার দেখা হলো। আজও উনি ফুল দিয়ে এসে আমার পাশে বসলেন। আজ আমরা আরও সহজ। একে একে অনেক কথাই বললাম। এমনি করে আরও দু' তিনদিন।

এর মধ্যে ও'র হোটেলে গিয়ে একদিন চা খেয়ে এলাম। আমার বন্ধুর বাড়িতে রাত্রে ওকে একদিন খাইয়ে দিলাম। ওঁর নাম যে পরিমল মিত্র, আর উনি যে মাইল ত্রিশেক দূরে এক কোলিয়ারী হাসপাতালের ডাক্তার তা আমার জানা হয়ে গেছে। আর পরিমল মিত্রেরও অজানা নেই যে, এই নির্জনতাপ্রিয় লোকটি রুদ্ধশ্বাস কলকাতার ব্যস্ততম অঞ্চলের এক লাল-ইঁট সরকারী দপ্তরের বশংবদ কেরানী। তবু সে ছুটি পেলেই পালিয়ে আসে লাল ইঁট আর লাল ফিতের দুঃস্বপ্ন থেকে। যদিও আবার ফিরে যেতে হয়, যেতেই হয় সেই ফাইলের অরণ্যে।

যে-কথাটা এতদিন বলি-বলি করেও বলতে পারিনি, সেদিন সন্ধ্যার সময় তা বলেই ফেললাম। আমি একটু আগেই এসে বসেছিলাম। পরিমলবাবু এলেন একটু পরে। ফুল দিয়ে আমার কাছে এসে বসলেন।

এক সময় বললাম, কৌতূহল মাফ করবেন, একটা কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করব ভাবি। কিন্তু সঙ্কোচে পারি না।

মনে হলো পরিমলবাবু যেন চমকে উঠলেন। বললেন, কোন সঙ্কোচ করবেন না। অল্পদিনের পরিচয় হলেও আমরা পরস্পরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারি। আপনি বলুন।

আপনার স্ত্রীর কি অসুখ হয়েছিল? যদিও জানা নেই মালতী মিত্র ওঁর স্ত্রী কিনা। প্রশ্ন ক'রেই লজ্জা হলো। যদি মালতী মিত্র ওঁর স্ত্রী না হয়।

পরিমল মিত্র যেন আবার চমকাল। ওঃ, মালতীর কথা বলছেন ?

যাক্‌, আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। তাহ'লে ভুল করিনি।

পরিমল মিত্রের মুখে আবার যেন ছায়া নামল। আবছা আলোতেও অনুভব করলাম, ওঁর চোখ দু'টো ম্লান হলো। ধীরে ধীরে বলল, টি-বি।

দু'টি মাত্র শব্দ। কিন্তু মনে হলো, যেন বহুক্ষণ ধরে আমার কানের পাশে উচ্চারিত হচ্ছে। কেন যে একথা জিজ্ঞাসা করতে গেলাম। সেদিন আর কোন কথা বলতে পারলাম না। পরদিন যথারীতি আবার দেখা, শালবনে ঢুকবার পথে। দু'জনে এক সঙ্গে শ্মশানে এলাম। আজকাল তাই আসছিলাম। ফুল দেওয়া হয়ে গেলে স্মৃতি ফলকের এক পাশেই দু'জনে বসে পড়লাম। পরিমলবাবুকে মনে হ'লো কেমন বিষণ্ণ।

চুপচাপ একটি সিগারেট শেষ করে দ্বিতীয়টি ধরিয়েছি—পরিমলবাবু বললেন, আমাকে মাফ করবেন, কাল আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলেছি। সেই থেকেই আমার মনে স্বস্তি নেই।

বুঝলাম অজান্তেই কোন নাটকীয় ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু আর কথা ফেরত নেবার উপায় নেই। চুপচাপ সিগারেটে টান দিতে লাগলাম। কী বলব আমি!

মালতী, পরিমলবাবু বললেন, আমার স্ত্রী নয়। কিন্তু আপনিই বলুন কেবলমাত্র দু'টো মন্ত্র পড়ে অথবা রেজিস্ট্রারের খাতায় নাম সই করে দু'টো শপথ নিলেই স্বামী-স্ত্রী হয় ? স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের মাপকাঠি কি কেবল এই অনুষ্ঠান !

পরিমলবাবু চুপ করলেন। আমি তখন হাতের সিগারেটে ঘন ঘন টান দিচ্ছি।

কিন্তু কেবল এইটুকু শুনলেই আমার আর মালতীর সম্পর্ক আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনাকে আরও খানিকটা শুনতে হবে। ভয় নেই, আপনার ধৈর্য নিয়ে আমি পরীক্ষা করব না। যত সংক্ষেপে পারি আমাদের কথা বলব আপনাকে। সবটুকু না শোনালে মালতীর প্রতি আমার কর্তব্যে অবহেলা হবে।

আমি ততক্ষণে নিজেকে তৈরী করে নিয়েছি। ঠিক করে ফেলেছি এমন কোন কথাই বলব না, যা'তে পরিমল মিত্রের কাহিনী বাধা পেয়ে বিস্তৃত হয়, অথবা আবেগে আপ্লুত হয়।

মালতীর সঙ্গে আমার পরিচয় থেকে যে কাহিনীর সূত্রপাত, পরিমলবাবু বললেন, তার একটু মুখবন্ধ আছে। মাস ছয়েকের ব্যবধানে আমার মা আর

বাবা যখন মারা যান আমার বয়েস বছর পনের। কলকাতার স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ি। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ছিলেন মামা। খবর পেয়ে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন উত্তরবঙ্গের এক বিখ্যাত জেলা শহরে। কলকাতার বাড়িটা ছিল নিজেদের। একতলায় ভাড়াটে ছিল, দোতলায় তালা পড়ল। চলে গেলাম মফস্বলে। মালতীদের বাড়ি আর মামার বাড়ি প্রায় পাশাপাশি। ছেলেবেলায় যখন মামার বাড়ি গেছি এক সঙ্গে অনেক খেলাধুলো করেছি। মালতীর মাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে আমার মা বৌদি বলতেন। মনে আছে, মা একবার মালতীর মাকে বলেছিলেন, বৌদি, তোমরা যদি বামুন না হ'তে তোমার মালতীকে আমি আমার ঘরে নিতাম। আমার একটা মাত্র ছেলে, ভয় করে কোন ঘরজ্বালানি মেয়ে এসে না ওঠে শেষ পর্যন্ত। ওর মা বলতেন, এ এক অদ্ভুত রীতি সমাজের। যদি ছাই বামুন-কায়েতের ঝামেলা না থাকত, মেয়েটাকে তোমার হাতেই তুলে দিতাম। এ যে সময়ের কথা তখন আমার বয়স বছর দশেক। মালতীর হয়তো সাত। ওঁর মা আমাকে বরাবরই স্নেহ করতেন। মা-বাবার মৃত্যুর পর সেটা বিশেষ ক'রে অনুভব করলাম। ওখানে নতুন ক'রে স্কুলে ভর্তি হলাম। এবার মালতীর সম্পর্কে কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলাম। বোধ হয় আমার বয়সের জন্যে। কিন্তু সে কেবল দু' একদিন। দু'চারদিন পরেই দেখলাম, মালতী আমার ছায়া হয়ে গেছে। আমার অভ্যাসের অঙ্গীভূত। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে আই এস-সি-তে ভর্তি হলাম। মালতী তখন স্কুলের উঁচু ক্লাশে পড়ে। কী করে ওর পড়ার সমস্ত দায়িত্বই যেন আমার ঘাড়ে চেপে গেছে।

আরও দু'টো বছর কাটল। আই এস-সি-র ফল বেরুলে আবার কলকাতা ফিরে এলাম ডাক্তারী পড়তে। আবার সেই চেনা পরিবেশ। দীর্ঘপ্রবাসের পর দেশে ফিরলাম যেন। মামা সঙ্গে এসেছিলেন ভর্তি করিয়ে দিতে। ওঁর ইচ্ছা ছিল বাড়িতে থেকে চাকর রেখে রান্না করে খাই। কিন্তু আমি হোস্টেলে থাকব ঠিক করলাম। ভর্তি করে দিয়ে মামা চলে গেলেন। সেই কোন কৈশোরে কলকাতা ছেড়েছি, আবার ফিরে এলাম যৌবনের প্রারম্ভে। দীর্ঘ বিরহের পর যেন প্রিয়া সঙ্গম। অপূর্ব উন্মাদনায় কাটল প্রথম ক'টা দিন। নতুন জন, নতুন পরিবেশ। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই সব যেন বিস্বাদ হয়ে এলো। অনেক রাতে দোতলা বাসে করে চৌরঙ্গী পাড়ি দেবার সময় মনে পড়ে কোন দূর মফস্বল শহরে ট্রেনের হুইস্‌ল্। নদীর চরা আর ঝাউয়ের সার।

আর—আর সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে একটি মেয়ের মুখ। তার কোন একটি ভঙ্গী। সেই মফস্বলের চেনা পরিবেশে যার কোন পৃথক অস্তিত্ব কোনদিন চোখে পড়েনি, কী আশ্চর্য, সেই আজ সবকিছু ছাড়িয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেইদিন ফাল্গুন সন্ধ্যায় দোতলা বাসে যেতে যেতে প্রথম অনুভব করলাম জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। পুরনো পরিবেশে আমি আর একজন নই, নতুন পরিবেশে আমি একক। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম আসেনি। কী এক অস্থিরতায় ছট ফট করেছি। যৌবনকে জানবার যে এত যন্ত্রণা কে জানত।

পরদিন থেকে পড়াশুনোয় মন দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হলো না। কোন রকমে দু'টো মাস কাটিয়ে গরমের ছুটি। আবার সেই মফস্বল শহর। নদীর চরে বনঝাউ, বনতুলসী আর—আর সেই মেয়ে—মালতী। শত চেষ্টা করেও কিন্তু এবার আমি সহজ হতে পারলাম না। নিজেকে নিয়ে আমার সে কি লজ্জা। চেষ্টা করলাম নিজেকে গোপন করতে, কিন্তু পারলাম না।

মালতী একদিন বলে বসল, তোমার কি হয়েছে বলতো?

মনে হ'লো, অপরাধ বুঝি ধরা পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে বললাম, কই না, কী আবার হবে। কিন্তু মালতী ভুলল না। বলল, না, কলকাতা থেকে ফিরে আসবার পরে তোমার কি যেন হয়েছে। হয়তো আমাদের এই পাড়া-গাঁ আর তোমার মনে ধরছে না।

ওকে ধমক দিলাম, চুপ কর ফাজিল মেয়ে, তোমাকে আর পাকামি করতে হবে না। নিজের পড়াশুনোয় একটু মন দাওতো। একটা হাল্কা কথা বলে কোন রকমে তাল সামলালাম।

ছুটির বাকী ক'টা দিন কোনরকমে এড়িয়ে এড়িয়ে কাটালাম। যেন কলকাতা পালাতে পারলে বাঁচি। কোনরকমে ছুটিটা শেষও করলাম। কিন্তু শেষরক্ষা আর হলো না। সেদিন রাত্রের ট্রেনে কলকাতা আসব। সন্ধ্যাবেলা মালতীদের বাড়ি গিয়েছিলাম ওঁর মাকে প্রণাম করতে। ওঁর মা তখন কুয়োর ধারে পা ধুচ্ছেন। আমাকে বললেন, ঘরে বোস, আমি আসছি।

বাইরের ঘরে ছোট ভাইবোনরা মাস্টারের কাছে পড়ছে। ভিতরের ঘরটা মালতীর পড়বার। অগত্যা সেইখানেই ঢুকতে হলো। মালতী তখন গভীর মনোযোগসহকারে সিভিক্স্-এর পাতায় ডুব দিয়েছে। মনে হ'লো, আমার উপস্থিতি বুঝি সে টেরও পায়নি। একটু ঠাট্টা করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, বাঃ, পড়াশুনোয় এত মনোযোগ হ'লো কবে থেকে?

মালতী বই থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। ওর চোখের দিকে তাকিয়েই আমার ভুল বুঝতে পারলাম। এতো আমার এতদিনের চেনা মালতী নয়, এ যে অন্য কোন মেয়ে, মেয়েও নয়, নারী। আমি ততক্ষণে নিজেকে তৈরী করছি। মালতী ধীরে ধীরে বলল, তুমি যেদিন থেকে বাইরে মনোযোগী হয়েছ।

কথাটা ভালো বুঝতে পারলাম না। বললাম, তার মানে?

তার মানে তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে ভাবিনি।

আমার কপালে ততক্ষণে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। অবস্থাটাকে আয়ত্তে আনবার শেষ চেষ্টা করে বললাম, তুমি কি আজকাল হেঁয়ালিতে কথা কইতে শুরু করলে নাকি? আমি ওসব বুঝি না। আজ রাত্রের ট্রেনে কলকাতা চলে যাচ্ছি জান বোধ হয়, তাই দেখা করতে এলাম।

এতক্ষণ হয়তো নিজেকে সামলাচ্ছিল মালতী। এবার ফেটে পড়ল। বলল, দেখা করতে এলাম—কে বলেছিল তোমাকে দেখা করতে আসতে! কে বলেছে শুনি! সারাটা ছুটি এড়িয়ে এড়িয়ে এখন যাবার আগে এসেছেন দেখা করতে। কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল! মালতী তখন ফুলে ফুলে কাঁদছে। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরলাম। বললাম—কী যে বলেছিলাম এখন আর মনে নেই। হয়তো কিছুই বলিনি—বলার দরকারও ছিল না। বাইরে যখন পায়ের সাড়া পেলাম আমার কাঁধ থেকে মাথা তুলে নিয়ে মালতী আবার সিভিক্‌স্‌-এর বই খুলে বসেছে। আঁচল দিয়ে জল মুছলেও চোখ দু'টো তখনও লাল। মেঘ সরিয়ে হঠাৎ রোদের মত ঠোঁটের ফাঁকে এক ঝিলিক হাসি উঁকি দিয়েছে। মাকে ডেকে বলল, ওমা এই দেখ, এতদিন পরে কলকাতা যাবার আগে তোমার ভাগ্নে দেখা করে ধন্য করতে এসেছেন।

আশ্চর্য মেয়ে মালতী। হয়তো মেয়েরাই আশ্চর্য। নিজেকে এত তাড়াতাড়ি কী করে সামলে নিলে কে জানে।

ওর মা বললেন, সত্যি পরিমল, তুমি আজকাল পর হয়ে গেছ। কই আগের মত আর সব সময় আস না। ও মেয়েটার পড়াশুনোর খোঁজ খবরও তেমন নাও না তুমি।

আমি বললাম, কী যে বলেন মামীমা। আপনিও দেখছি মালতীর মত হলেন। তারপর আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে এক সময় উঠে পড়লাম।

হঠাৎ এক সময় গল্প থামিয়ে পরিমলবাবু বললেন, আমি হয়তো আপনার ওপর অত্যাচার করছি। কাহিনীর চেয়ে ভূমিকা দীর্ঘতর করছি।

আমি বাধা দিলাম, না, না, তা ভাববেন না। ঘটনা না ব'লে কাহিনীই বলুন আপনি। যে-কথা যেমন আসে তেমনটি।

না, ভূমিকা শেষ হয়ে এলো, পরিমলবাবু বললেন। রাত ক'টা বাজল? আপনার বোধ হয় অনেক রাত হলো। বাকীটা না হয় কাল শুনবেন।

আমি বললাম, না, না, রাত এমন কিছুই হয় নি। মনে করুন, ঘড়ি বন্ধ। আপনি বলুন।

আচ্ছা তবে শুনুন, পরিমলবাবু আরম্ভ করলেন, এর পরে ক'টা বছরে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটেনি। কেবল আমরা তখন পরস্পরের আরও কাছাকাছি এসেছি। খোলাখুলি কোন কথা না হ'লেও মনে মনে জানি, আমরা বিয়ে করব। আমাব ফাইন্যাল এম-বির আব মাস ছয়েক আছে। মালতী বি-এ পাশ করে এম-এ পড়তে কলকাতায় পিসীর বাড়ী এসে উঠল। পড়াটা বড় কথা নয়। পিসীমার বাড়ী না থাকলে পড়া হয়তো হতোওনা। বাপ সাধারণ চাকরে। উদ্দেশ্য ছিল বয়ের ব্যবস্থা। কলকাতায় যদি কোন ভালো ছেলে পাওয়া যায়। মফস্বল শহরের গণ্ডী থেকে কলকাতার বিস্তৃতিতে মুক্তি পেলাম আমরা। আমি আব মালতী। কিন্তু উদ্দাম হতে পারলাম না। কূল ভাঙতে গেলেই মালতী বাঁধ বেঁধে দাঁড়ায়। তর্জনী তুলে দেখায় আমার সামনে পরীক্ষা। যেন ও আমাব অভিভাবিকা। বললাম, আচ্ছা, দাঁড়াও, পরীক্ষাটা চুকিয়ে নিই, তারপরে তোমার গার্জেনি করা দূর করছি। পরীক্ষাটা কোনরকমে শেষ করলাম। আব শেষ করেই আর্জি পেশ করলাম বিয়ের। যা থাকে কপালে আর দেরী নয়।

কিন্তু, পরিমলবাবু একটু থামলেন, বিপদ এলো অভাবিতভাবে। আমাদের মেলামেশা খুব স্বাভাবিক কারণেই ওঁব পসীমাদের ভালো লাগেনি। ব্যাপারটা আরও ঘোরাল করে তুলেছিল ওঁর পিসীমার এক ভাসুরপো, ওদের সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়তো। সে-ই বাড়িতে বলেছে, মালতী ক্লাশ পালিয়ে আমার সঙ্গে চলে যায়। রাস্তাঘাটে ঘুবে বেড়ায়। পিসীমা তাকেই পল্লবিত করে লিখেছিলেন ভাই-এর কাছে। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম এলো, মালতীর মায়ের অসুখ। মালতী যেন এক্ষুণি রওনা হয়। টেলিগ্রাম পেয়েই ছুটে এসেছিল আমার কাছে। বললাম, ভয় নেই দরকার হলে আমাকে টেলিগ্রাম ক'রো। বিশ্বাস করো বিয়েটায় ফাঁকি দিই নি। ও হাসল। সে দেখা যাবে আমার অসুখের সময়।

বললাম, পৌঁছেই টেলিগ্রাম ক'রো।

কিন্তু টেলিগ্রাম এলো না। এমন কি সাতদিনের মধ্যে কোন চিঠি পর্যন্ত নয়। ব্যস্ত হয়ে ওকে চিঠি লিখলাম—জবাব নেই। তখন লিখলাম আমার বোনকে। জবাব পেয়ে চিন্তিত হলাম। চিঠির মর্মটি ছিল, মালতী যেদিন কলকাতা থেকে ফেরে তার পরদিনই কোন চা-বাগানে মাসীমার কাছে চলে গেছে। ওর মাও সেখানেই। তবে তাঁর কোন অসুখ নেই।

পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। টিকিট কেটে গাড়িতে উঠলাম। আমাকে হঠাৎ আসতে দেখে মামাবাড়ির সবাই অবাক। মামীমার মুখ কেমন গম্ভীর মনে হলো। মামা শুধু বললেন, এ সময়টা এখানে না এসে পরীক্ষার তদ্বির করলেই ভালো হতো। কিন্তু আমার কথা ওঁদের বোঝাব কী করে। পরদিন সকালে উঠে কাউকে না জানিয়ে মালতীদের বাড়ি গেলাম। ওর বাবা বারান্দায় বসে তেল মাখছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, এই যে, হঠাৎ কি মনে করে?

বললাম, মামীমাব অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে মালতী হঠাৎ চলে এলো আর কোন খবর নেই—তাই—

নাকে খানিকটা তেল দিয়ে উনি বললেন, ও! তাই তুমি এলে খোঁজ নিতে?

বুঝলাম কোথাও কোনও একটা গোলমাল হয়েছে। উৎকণ্ঠা গোপন রেখে বললাম, হ্যাঁ, তাই।

এবার উনি ফেটে পড়লেন, হ্যাঁ তাই, পাজী বদমাস ছেলে কোথাকার, বেরোও আমার বাড়ি থেকে। লোভ দেখিয়ে আমার মেয়েটার সর্বনাশ করবার মতলব।

বুঝলাম, আর উপায় নেই। কিছু লুকিয়ে লাভ নেই। বললাম, আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন, মালতীকে আমি বিয়ে করতে চাই, আর ওরও এতে অমত নেই।

এবার আর উনি আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। বললেন, কী বললি তুই—বলে তেলের বাটিটা ছুঁড়ে মারলেন আমার দিকে। বাটিটা লাগল এসে আমার কপালে। রুমাল দিয়ে কপাল চেপে ধরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম। বাড়িতে অবশ্য বলেছিলাম, পড়ে গিয়ে কেটে গেছে। জানি না বিশ্বাস করেছিল কিনা।

পরিমলবাবু অন্যমনস্কভাবে কপালে একবার হাত দিলেন। বললেন, বুঝলাম ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। চা-বাগানের খোঁজটা পর্যন্ত পাওয়া গেল না। রাত্রের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে এলাম। মনে আশা ছিল ফিরে এসে হয়তো মালতীর চিঠি পাব। কিন্তু ডুয়ার্সের সে অরণ্য থেকে চিঠি কি করে লিখবে মালতী। একথা অবশ্য পরে জেনেছিলাম।

মাস ছয়েক গেল। পরীক্ষায় পাশ ক'রে তখন হাউস সার্জন হয়েছি। মামা-মামীর চিঠিতে মালতী বলে তারা যে কাউকে চেনেন তার আভাস পর্যন্ত নেই। আমারও অভিমান হলো। একখানা চিঠিও তো অন্তত দিতে পারত। সে তো নাবালিকা নয়। কিন্তু কোন চিঠি এলো না। প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কোনদিন মামাবাড়ীর শহরে যাব না।

সার্জারিতে নম্বর ভাল পেয়েছিলাম। অধ্যাপকের সুপারিশে বিলেত যাবার একটা স্কলারশিপের আশ্বাসও পেয়েছি। ঠিক করেছি, না হলে নিজের টাকায় চলে যাব। বাবা কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। দরকার হ'লে বাড়িটাও বিক্রী করে দেব ঠিক করলাম। লেখালেখি ক'রে সিট পেলাম। পাশপোর্টের দরখাস্তও ক'রে দিলাম। মামাকে কিছুই জানাইনি অভিমান ক'রে। সব ঠিক ক'রে একটা চিঠি দিলাম। উত্তর এলো মামীমার কাছ থেকে। লিখেছেন, আমি সাবালক হয়েছি। এখন নিজের ভালোমন্দ নিজে ভাববার অধিকার জন্মেছে। তাঁদের সাধ্যমত কর্তব্যে তাঁরা ত্রুটি করেননি। যাবার আগে যেন একবার দেখা করে যাই। পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন, দীর্ঘদিন যাবত মালতীর কঠিন অসুখ। ডাক্তার বলেছে যক্ষ্মা। ওঁর মার ইচ্ছা আমি যেন একবার ওকে দেখে যাই।

চিঠি পড়ে আমি হিম হয়ে বসে রইলাম। মালতীর যক্ষ্মা। আর সে খবর এতদিন পরে আমি পেলাম। আমার অভিমান গেল, মালতীর বাবার ব্যবহার ভুললাম। তাড়াতাড়ি স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে গাড়িতে উঠলাম।

মালতীকে দেখে আত্মধিক্কারে মরে যেতে ইচ্ছে হলো। ডাক্তারীর ছাত্রের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝলাম, রোগ অনেক দূর এগিয়েছে। প্লেট দেখে আর বুক দেখে ধারণা বদ্ধমূল হ'লো। নিজেকেই অপরাধী মনে হলো। আমি যতদিন অভিমান নিয়ে দূরে চলে গেছি মৃত্যু ততদিন একটু একটু ক'রে তার অধিকার বিস্তৃত করেছে। আজ হয়তো বিজ্ঞানকে সে হার মানাবে। যদি আর কিছু-দিন আগেও খবর পেতাম। বিজ্ঞানের ছাত্র আমি, এদের অবহেলার জন্যে বিজ্ঞানের পরাজয়ের কথাটাই আমার আগে মনে এলো।

মালতী বলল, আবার যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে ভাবিনি। শুনলাম, বিলেত যাচ্ছ, কবে যাবে ?

কিছু না ভেবেই বললাম, তোমার অসুখ সারলে।

মালতী হাসল। সে-হাসি পরে আরও অনেকবার মালতীর মুখে দেখেছি। বলল, তা'হলে আর বেশী দেরী নেই।

বললাম, না, নেই তো। তুমি তাড়াতাড়িই সেরে উঠবে।

মালতী মৃদু গলায় বলল, না, তাড়াতাড়িই মরব। কেন আর অযথা সে-কটা দিনই অপেক্ষা করবে। সব ব্যবস্থা বাবাই করবেন। তুমি চলে যাও।

আমি বললাম, কী ছেলেমানুষীই করছ তুমি। অসুখ যেন আর কারও হয় না। তা'ছাড়া জান ডাক্তারী আমি ভালোভাবে পাশ করেছি। তোমার চিকিৎসার সব দায়িত্বই এখন থেকে আমার।

আবার সেই হাসি হাসল মালতী। বলল, হ্যাঁ, শুনেছি সহস্রমারী না হ'লে ভালো ডাক্তার হয় না। আমাকে দিয়েই তাহ'লে শুরু কর।

এবার ওর মা-ই ধমক দিলেন। বললেন, কী হচ্ছে মালতী, এতদিন পরে পরিমল এলো, একটু গল্প কর।

ওর বাবার সঙ্গে দেখা হলো বিকেলে। সাত আট মাসে বয়স যেন সাত আট বছর বেড়ে গেছে। বললেন, এই যে পরিমল, কবে এলে ?

আশ্চর্য, সেদিনের ঘটনা যেন বেমালুম ভুলে গেছেন।

ওঁর কথার উত্তর না দিয়ে প্রফেশন্যাল ফিজিসিয়ানের মত বললাম, মালতীর চিকিৎসার কী ব্যবস্থা করেছেন ?

কী আর ব্যবস্থা হবে বল ? সামর্থ্যে যেটুকু ছিল বাকী রাখিনি। এর বেশী আর কিছু করবার নেই। মালতীর বাবা ক্লান্ত গলায় বললেন। এই প্রথম ওঁর প্রতি আমার করুণা হ'লো।

বললাম, কিন্তু হাল ছাড়লে তো চলবে না। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে তো।

বললেন, তুমি কি বলতে চাও ?

বললাম, ওকে এক্ষুণি কলিকাতা নিয়ে যেতে হবে।

উনি বললেন, আমার আর্থিক অবস্থা তো তুমি জান। এই ক'মাসেই সর্বস্বান্ত হয়েছি। ওর বিয়ের জন্যে যে ক'টা টাকা জমিয়েছিলাম তা-ও শেষ হ'য়েছে।

মুখে একটা শক্ত কথা এসেছিল। অতি কষ্টে চেপে বললাম, টাকার ভাবনা আপনাকে করতে হবে না। আপনি ছুটির ব্যবস্থা করে কালই ওকে নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন।

উনি করুণভাবে বললেন, কিন্তু—

বললাম, আর কিন্তু নয়, বিশ্বাস করুন, আপনার সর্বনাশ করবার ইচ্ছা আমার নেই। ব'লেই চলে এলাম।

আমার প্রস্তাব শুনে মামা কিছু বললেন না। মামীমা বললেন, তোমার বয়েস হয়েছে, যা ভালো বোঝ করবে।

মালতীকে নিয়ে কলকাতা এলাম। চেস্ট স্পেশ্যালিস্ট এক অধ্যাপককে দেখালাম। তিনি বললেন, এতদিন কী করছিলে?

কী করছিলাম ওঁকে কী ক'রে বোঝাব। হাসপাতালে সিট পাওয়া গেল না। ডাক্তার পরামর্শ দিল কলকাতার বাইরে নিয়ে আসতে। এখানেও হাসপাতাল আছে। তারই কাছেপিঠে থাকলে স্পেস্যালিস্টের সাহায্যও পাওয়া যাবে, এ জায়গার স্বাস্থ্যও ভালো। কথাটা মালতীর বাবাকেও বললাম। উনি বললেন, সে কি ক'রে হবে, ছুটি ফুরিয়ে গেল। বললাম, তাই ব'লে ওকে মেরে ফেলতে চান?

বললেন, কিন্তু চাকরিটি গেলে যে, সবাই মিলে মরতে হবে।

যুক্তি অকাট্য।

কিন্তু একবার ভুল করেছি জীবনে। দ্বিতীয়বার ভুল করতে পারি না। বললাম, তাহ'লে আপনি একা ফিরে যাবেন। মালতী যাবে আমার সঙ্গে। ভাবলাম, এর পরে উনি আমাদের সঙ্গে যাবেনই। কিন্তু আশ্চর্য, বললেন, তাহ'লে তাই যাও। তুমিই নিয়ে যাও ওকে।

আমি অবাক। আঘাত দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, কিন্তু তা'তে আপনার সর্বনাশ হবে না? লোকের কাছেই বা মুখ দেখাবেন কী করে?

আমাকে অবাক ক'রে মালতীর বাবা বললেন, কতদিনই বা বাঁচবে ও। লোকে জানবে বিহারে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি।

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। এ লোককে কিছু বলবার মত প্রবৃত্তিও ছিল না আমার। আর সবচেয়ে বেশী হচ্ছিল করুণা। আমার কপালের সেই দাগটি আজও মেলায়নি। শুধু মনে হল এঁরা অসহায়।

আমি এবার টিনের শেষ সিগারেটটিতে অগ্নিসংযোগ করলাম।

পরিমলবাবু বললেন, আর বেশীক্ষণ বিরক্ত করব না আপনাকে। আমার গল্প শেষ হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ভাড়া করে মালতীকে নিয়ে চলে এলাম এখানে। ওঁর বাবা কলকাতা থেকেই ফিরে গেলেন বাড়িতে। কিন্তু মালতীর অসুখ আর কমল না। বেড়েই চলল। এখানকার হাসপাতালের ডাক্তারদের সহৃদয়তার কথা ভুলব না কোনদিন। কিন্তু অন্যায় যুদ্ধের মুখোমুখি বিজ্ঞান কী করবে। প্রথম থেকে যদি সুযোগ পেতাম। কিন্তু, পরিমল মিত্র দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। সে যাকগে।

আবার গল্পে ফিরে এলেন তিনি। বললেন, বাসাটা ছিল লোকালয়ের বাইরে। খোঁজখবর কেউ নিত না, এক হাসপাতালের ডাক্তাররা ছাড়া। প্রফেশন্যাল ইনকুইজিটিভনেস্ ছাড়া আর কিছু ছিল না তাঁদের। কাজেই আমাদের সম্পর্ক নিয়ে কেউ কোনদিন মাথা ঘামায় নি। মালতীকে হয়তো আমার স্ত্রী ব'লেই ধরে নিয়েছিল।

ডাক্তারের জ্ঞান নিয়ে বুঝতে পারছিলাম মালতীর জীবনীশক্তি মুমূর্ষু। আর বেশীদিন লড়াই করতে পারবে না। রোগীর ইনটুইশান নিয়ে এ সত্যের সন্ধান বোধ হয় মালতীও পেয়েছিল। একদিন আমার হাত ধ'রে বলল, জানি আর বেশীদিন বাঁচব না! মরবার আগে যা পেলাম তা কোনদিন কল্পনাও করিনি। কিন্তু দুঃখ থেকে গেল তোমার স্ত্রী এই পরিচয় নিয়ে মরতে পারলাম না।

আমি বললাম, কিন্তু কেবল দুটো মন্ত্র পড়লে অথবা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের খাতায় নাম সই করে শপথ নিলেই বুঝি স্বামী স্ত্রী হয়? ভালোবাসা কি কিছুই নয়! সেই অধিকারেই আমরা স্বামী-স্ত্রী। পরিমলবাবু বললেন, কথাগুলো এখন একটু নাটুকে লাগছে হয়তো। কিন্তু জীবন থেকেই তো নাটক হয়। আমার কথা শুনে মালতী হাসল। এই শেষবার দেখলাম সেই হাসি। বলল, তোমরা পুরুষরা এ দুঃখ বুঝবে না। যুক্তি মেনে নিলেও মন মানে না। আমার মৃত্যুর পরেই আমার অধিকারের সীমানা সঙ্কুচিত হবে সেটা আমরা সইতে পারিনে। মালতী ভট্টাচার্যের মৃত্যু হোক সে আমি চাইনি। আমি চেয়েছিলাম, লোকে জানুক, মালতী মিত্রের মৃত্যু হয়েছে।

বুঝলাম, যুক্তির সীমানা এখানে শেষ। বললাম, তোমার কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকবে না মালতী।

পরিমলবাবু হঠাৎ থামলেন।

আমি বললাম, তারপর ?

প্রাণপণ চেষ্টায় গলার স্বর স্বাভাবিক ক'রে পরিমলবাবু বললেন, ঠিক করলাম, যে-ক'রেই হোক, বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, জেলা শহর ছাড়া ম্যারেজ রেজিস্ট্রার নেই। ভাবলাম, যত টাকা লাগে তাঁকে এখানে নিয়ে আসব।

এখানে গল্পে আবার ছেদ পড়ল। ফের যখন কথা বললেন, গলা কাঁপছে। বললেন, সে-সময় আর পাওয়া গেল না। সেই রাত্রেই মালতী মারা গেল। মালতী ভট্টাচার্য। কিন্তু সে তো কেবল অন্যের চোখে। আর সেই তাদের জন্যেই এই স্মৃতিফলক, মৃত্যুকে যারা কেবল স্মৃতিফলক দিয়েই স্মরণ করে।

শেষ সিগারেটের আগুন আঙুলের ডগায় লাগল। হাতের পাতার মধ্যে সিগারেট ঘুরিয়ে নিয়ে মধ্যমা, তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে আলতোভাবে চেপে ধ'রে শেষ টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। ম্লান জ্যোৎস্নায় স্মৃতিফলকের কালো লেখাগুলো একাকার হয়ে গেছে।

পরিমলবাবু বললেন, ছুটি ফুরিয়ে গেছে। কাল আটটার বাসে রওনা হচ্ছি। অনুরোধ রইল, এদিকে এলে আমার ওখানে একবার যাবেন।

জিনিসপত্র সব বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে। হাউস সার্জন যথাবিধি উপদেশ দিয়ে গেছেন। এখন সুপ্রভার চারদিকে মেয়েদের ভীড়। যদিও এখন বিকেল তিনটে, সুপ্রভার স্বামীর আসবার কথা সাড়ে চারটের ট্রেনে, তবু এখনই দেখা সাক্ষাৎ শেষ করবার সময়। এরপর চারটে থেকে আরম্ভ হবে ভিজিটরদের ভিড়।

যারা চলে ফিরে বেড়াতে পারে ত'রা প্রায় সবাই এসে ঘিরে ধরেছে সুপ্রভাকে। এখানে বিছানায় শুয়ে সুপ্রভার মুখখানা ভালো করে দেখতে পারছে না বিশাখা। পাশের বেডের পার্টিশান স্ক্রীনটা কে যেন আড়াআড়ি করে প্যাসেজের দিকে টেনে দিয়েছে। বিশাখার বিছানা ছেড়ে ওঠা বারণ। এখনও রোজ জ্বর হয়। মাথা তুললেই ওয়ার্ড সিস্টার রমা সেন তেড়ে আসবে। বকবে যাচ্ছে-তাই করে। এসব বিষয়ে ভারি কড়া রমাদি। এতটুকু এদিক-ওদিক হবার জো নেই। মেয়েরা ওর নাম দিয়েছে জল্লাদ। এমন কিছু বয়স নয় রমা সেনের। মেয়েদের বয়স অবশ্য মেয়েরা নিরপেক্ষভাবেও দুচার বছর বাড়িয়ে দেখে। কিন্তু অনেক বাড়িয়েও ত্রিশ বত্রিশের ওদিকে রমা সেনকে নিতে পারেনি বিশাখা। দেখতে শুনতে একবাক্যে ভালো বলা চলে। কপালের ওপর কুঞ্চনের যে রেখাগুলো চিলের মত ডানা ছড়িয়ে দিয়েছে, বিশাখার মনে হয়েছে, তা সব মিথ্যে। পোশাকী। গম্ভীর দুখানা ঠোঁটের নীচে স্নিগ্ধ হাসির রেখাটি বোধহয় ধমক খেয়ে মুখ গোমড়া করে আছে। শিয়রে এসে যখন কপালে হাত দেয় রমা সেন হাত দুখানা আর একটুক্ষণ চেপে ধরে রাখতে ইচ্ছা করে। সে হাতে এমন কিছু আছে রমা সেনের ভ্রুকুটিকুটিল কপালের সঙ্গে যার একেবারেই মিল নেই। কে জানে হয়তো সেই জন্যই তিন নম্বর ওয়ার্ডের মেয়েরা তাকে এত ভয় করে। রোগীদের এতটুকু শৈথিল্যের ক্ষমা নেই তার কাছে।

বিশাখা মাথা তুলতে গিয়েছিল কিন্তু রমা সেনের কথা মনে করে আর মাথা তুলল না। সুপ্রভা এবার উঠে দাঁড়াল। যে সব মেয়েরা বিছানায় শুয়ে আছে একে একে তাদের কাছে চলল। ওদিক থেকে ঘুরে এসে এক সময় বিশাখার সামনে দাঁড়াল। মাথায় বড় একটা খোঁপা, লালপাড় সাধারণ এক-

খানা মিলের শাড়ি পরনে, কপালে টকটকে সিঁদুরের টিপ। মুখখানা কেমন ম্লান। সুপ্রভার মুখে হাসি নেই। একটু যেন থমথমে। অবশ্য হাসিমুখে এখান থেকে বড় কেউ যায় না। এখানে যারা আসে দু-এক বছর তাদের সবাইকেই থাকতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে, একটু একটু করে কখন যেন সবাই জড়িয়ে যায়। আসবার পর প্রথম দুচার দিন কেমন ভয় ভয় করে। ঘর ভর্তি রোগী। কেমন গা ছমছম করে। তারপর, দুচার দিন বাদে, আবার সব ঠিক হয়ে যায়। এ ওর সঙ্গে কেমন জড়িয়ে যায়। নতুন জীবনের শরীক হয়ে পড়ে। রোগ-মুক্ত হয়ে ফিরে যাবার সময় মনে হয় নিশ্চিত জীবন থেকে অনিশ্চিত পরিবেশের দিকে পা বাড়াচ্ছে বুঝি। যাদের ছেড়ে আসতে একদিন বেদনার অবধি ছিল না তাদের কাছে ফিরে যেতেও আবার অস্বস্তি লাগে। রোগ সারলেও অন্য লোকের ভয় সারে না। নিজেকে মনে হয় অবাঞ্ছিত। মুক্তির প্রতীক্ষা করতে করতে একদিন সব মোহ কেটে যায়। ছাড়া পাবার স্বাদ যায় ফিকে হয়ে। সুপ্রভাও, বিশাখা ভাবল, তার ব্যতিক্রম নয়।

সুপ্রভা বলল, চললাম ভাই। আব তো থাকতে দেবে না।

কেন, থাকতে দিলে থেকে যেতে নাকি? বিশাখাব স্বরে কৌতুক।

কে জানে, হয়তো যেতাম। সুপ্রভাব কথায় বিষাদটুকু বিশাখার কান এড়াল না।

বরং তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। তেমনি লঘু স্বরেই বলল বিশাখা।

সুপ্রভার মুখ দেখে মনে হলো না পরিহাসটুকু ওর মাথায় ঢুকেছে। বিশাখা কথার মোড় ঘোরাল। বলল, তোমার স্বামী তো থাকেন জলপাইগুড়ি। এখন তাহলে তো সেখানেই যাবে? আর বোধহয় দেখাই হবে না জীবনে। তুমি তো নিজের ঘরে চললে, আমি হয়তো আর কোনদিন এখান থেকে বেরুতে পারব না।

ছিঃ ওকথা বলছ কেন? তোমার এমন কীইবা হয়েছে। একটা দিকে দু-তিনটে ক্যাভিটি মাত্র। ওতো কিছুই নয়। আমি এসেছিলাম যে অবস্থায় তা যদি দেখতে। দুটো দিকই ধরে গেছে। ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠত মুখ দিয়ে। এমনকি ডাক্তাররাও ভাবেনি আমি বাঁচব। তবু তো বেঁচে উঠলাম। রমাদিই বাঁচিয়ে তুললেন বলতে পার। তুমি তো দু এক মাসেই ভালো হয়ে যাবে, আমি রমাদিকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিছু ভেবো না।

ওদিকে তের নম্বর বেডের বাচ্চা মেয়েটা ডাকল সুপ্রভাকে।

বলল, সুপ্রভাদি আজ চলে যাচ্ছ ?

হ্যাঁরে, সুপ্রভা ওর দিকে এগিয়ে গেল।

একে একে সবার কাছে গিয়ে দেখা করল সুপ্রভা। এদিকে ঘড়ির কাঁটা চারের ঘর ছুঁই ছুঁই। শেষ ভাদ্রের বিকেলের রোদ লাল হয়ে জ্বলে উঠেছে জানালার কাঁচে। ভেন্টিলেটরের ফোকরে বসে একটা চড়াই ঠোঁটে করে খড়কুটো সাজিয়ে বাসা বাঁধছে। একজোড়া কুকুর গলাগলি ঘুরে বেড়াচ্ছে সামনের বারান্দায়। বাইরে রিক্‌শ থামবার শব্দ হলো। ওয়ার্ডের প্রথম ভিজিটর ঘরে ঢুকলেন। হাতে ফলের ঠোঙ নাকে রুমাল। বোঝা গেল ইনি এসেছেন দু-মাইল দূরের শহর থেকে। বেশীর ভাগ লোকই আসে স'চারটের ট্রেনে। একে একে আরও দুচারজন ভিজিটর ঘরে ঢুকল। যে সব রোগী উঠতে পারে তারা ভিজিটরের সঙ্গে বাইরে গিয়ে বসল। বিশাখা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। তার কাছে আজ আর কেউ আসবে না। কলকাতা এখান থেকে ত্রিশ মাইল। সপ্তাহে একদিনেব বেশী আসা সব সময় সম্ভব হয় না। তবু বিশাখার স্বামী অমলেশ অন্তত দুদিন আসে।

দূরে ট্রেনের বাঁশী শোনা গেল। কলকাতার ট্রেন এলো। এই ট্রেনেই সুপ্রভার স্বামী আসবে। সুপ্রভার বেডের দিকে তাকাল বিশাখা। সুপ্রভা নেই। হয়তো বারান্দায গিয়ে দাঁড়িযেছে। বেচাবা কতদিন দেখেনি স্বামীকে। অতদূরে থাকে, আসতে পারে না।

ট্রেনের ভিজিটররা একে একে আসতে শুরু করল। কিন্তু সুপ্রভার স্বামী এলো না। দশ নম্বরের মেয়েটি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। এসে বলল, সুপ্রভাদি রমাদির সঙ্গে চলে গেল। একটু পরে আয়া এসে জিনিসত্র নিয়ে গেল সুপ্রভার। ওয়ার্ডের মেয়েদের মধ্যে তখন নানারকম আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। কিছু কিছু বিশাখার কানেও এলো। একজন বলল, বোধহয় একুশ নম্বর, তোমরা দেখে নিও ও নিশ্চয়ই আবার বিয়ে করেছে। পুরুষজাতটাকে চিনতে আমার বাকী নেই।

আর একজন বলল, এমন কথা বলছ কেন, হয়ত বেচারার কোন বিপদ-আপদ হয়েছে, তাই আসতে পারেনি।

বিপদ-আপদ, আবার একুশ নম্বরের গলা, তাহলে একটা টেলিগ্রামতো লোকে করে। গত ছ মাসের মধ্যে একটা চিঠি পর্যন্ত আসতে দেখিনি সুপ্রভার নামে।

এবার আর কেউ কথা বলল না। বিশাখার চোখে ভাসছিল সুপ্রভার ম্লান মুখে সিঁদুরের টিপটা। সুপ্রভার কথাগুলোও ভাববার চেষ্টা করছিল বিশাখা। কে জানে স্বামী যে আসবে না একথা হয়তো সুপ্রভা জানত।

দেয়াল ঘড়িতে ছটা বাজল। হালকা কুয়াশার ওড়না জড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। শেষ ভিজিটরটিকে নিয়ে সাইকেল রিক্‌শ চলে গেল।

রমা সেন এলো টেম্পরেচার নিতে। অনেকক্ষণ থেকেই রমাদির সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল বিশাখা।

থার্মমিটর মুখে দেবার আগেই জিজ্ঞাসা করল, সুপ্রভা কোথায় গেল রমাদি, ওর স্বামী তো আসেনি, তাই না?

রমা তাকাল বিশাখার মুখের দিকে। চোখ দুটো, বিশাখার মনে হলো, দপ করে জ্বলে উঠল বুঝি। কিন্তু বিশাখার চোখের দিকে তাকিয়েই আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো। বিশাখার দিকে তাকিয়ে কি বুঝল কে জানে। বলল, আমার ওখানেই আছে।

তোমার ওখানে কেন?

ওরতো রিলিজ অর্ডার হয়ে গেছে। আজ থেকে এখানে আর সীল পাবে না। আর কথা বলতে না দিয়ে বিশাখার মুখে থার্মমিটর পুরে দিল। থার্মমিটার তুলে জ্বর দেখল, চার্ট লিখল তারপর পাশের বেডে চলে গেল।

যে কথাটা জিজ্ঞাসা করবার ছিল তা আর হলো না। বিশাখার মনে কেবল ঘুরে ঘুরে সুপ্রভার কথাটাই আসছিল। বেচারা নিশ্চয়ই খুব মুষড়ে পড়েছে। নিজেকে দিয়ে বিচার করল বিশাখা। তার রিলিজ হবার দিনে যদি এমন করে না আসে অমলেশ? তাহলে, তাহলে কী? এমন অসম্ভব কথা বিশাখা ভাবতে পারল না। অথচ সুপ্রভার স্বামী আসেনি। কিন্তু কেন এলো না? বিশাখা জানে এর জবাব দিতে পারে একমাত্র রমাদি। আর রমাদিকে একথা বিশাখা ছাড়া আর কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। একমাত্র তাকেই কিছুটা প্রশ্রয় দেন রমাদি। গোমড়া মুখো মুখোশটা মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে একমাত্র তার কাছেই খুলে পড়ে।

নাইট সিস্টারকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে যাবার সময় রোগীদের একবার খোঁজ খবর করে যান রমাদি। বিশাখার সঙ্গে রোজই দু'চারটে কথা বলেন। বাড়ির কথা, ঘরের কথা। অমলেশকে নিয়ে অনেক সময় এক আধটু লঘু পরিহাসও করেন। বিশাখা ভাবল কথাটা তখনই জিজ্ঞাসা করবে।

ডিউটি শেষ করে যাবার পথে যথারীতি এল রমা সেন।

বিশাখা ভয়ে ভয়ে বলল, রমাদি, একটা কথা বলবে?

বিশাখার চোখে চোখ রাখল রমা সেন। না, এবার আর তার চোখ জ্বলে উঠল না। বরং বিশাখার মনে হলো রমাদির চোখে যেন প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত আছে।

সুপ্রভার স্বামী এলো না কেন? কথাটা জিজ্ঞাসা করেই ভয়ে ভয়ে তাকাল বিশাখা।

বিশাখা কী জিজ্ঞাসা করবে তা যেন আগে থেকেই আন্দাজ করেছিল রমা সেন। বলল, সুপ্রভার স্বামী আর আসবে না। আশ্চর্য নির্লিপ্ত কণ্ঠ।

বিশাখা চমকে উঠল। বলল, তার মানে তুমি কি বলছ রমাদি?

আসবেনা মানে আসবে না। এত সহজ কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন?

সহজ কথা! বিশাখার কথা প্রায় আর্তনাদের মত শোনাল। কিন্তু রমা সেনের মুখে কোন পরিবর্তন নেই। খুব সহজ গলায় বলল, বা, সহজ কথা নয়? স্ত্রীর থাইসিস হয়েছে, চেষ্টা চরিত্র করে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হলো। ফ্রি বেড মিলল, সরকারী সাহায্য পাওয়া গেল। সে কবে কতদিনে সুস্থ হয়ে ফিরবে অথবা আদৌ ফিরবে কি না, ফিরলেও তাকে নিয়ে ঘরকরা নিরাপদ হবে কিনা কে বলতে পারে। স্ত্রীর না হয় অসুখ, স্বামীর তো আব অসুখ হয়নি। সে বেচাবা অনিশ্চিত ভবিষ্যতেব দিকে তাকিয়ে নিজেকে কেন বঞ্চিত করবে। তার চেয়ে আর একটা বিয়ে করা ঢের ভালো।

আর একটা বিয়ে! তুমি কী বলছ রমাদি, একি কখনও সম্ভব? বিশাখার গলা কাঁপছিল। বোধ হয় হাতও।

রমা তার বাঁ হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিল। বলল, কেন, অসম্ভব বলছ কেন বিশাখা?

অসম্ভব কেন—মনে মনে বলল বিশাখা। এমন অসম্ভব কথার যুক্তি খুঁজতে গিয়ে সব কেমন জট পাকিয়ে গেল। কেবল অমলেশের দু'টো চোখ মনে এলো। কেবল দু'টি চোখ, কিন্তু সেই কি সব নয়! কিন্তু একথা তো যুক্তি হিসাবে বলা যাবে না। এতো যুক্তি নয়, এ বিশ্বাস। যুক্তি কি এর চেয়ে বড়? বিশাখা নিজের মনে ভাবল। কোন কথা বলল না। চুপ করে রইল।

রমা যেন ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিতে পেরেছিল। বলল, বুঝতে পেরেছি কেন তোমার অসম্ভব মনে হবে। কিন্তু সবাইতো সমান নয়। একজনের কাছে যা অসম্ভব অন্যের কাছে তাই সম্ভব।

তাহলে তুমি কি বলতে চাও সুপ্রভার স্বামীর পক্ষে আবার বিয়ে করা সম্ভব?

সম্ভব নয়—সে তাই করেছে।

তাই করেছে! তুমি কী করে জানলে?

কিছুটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম। সবটাই তার বিশ্বাস করবার মত নয়। কিন্তু এখন আর অবিশ্বাস করার কিছু নেই। একটু থামল রমা। তারপর বলল, তেমনি ধীরে ধীরে, তেমনি নির্লিপ্ত গলায়, এ রকম ঘটনা এই প্রথম নয় বিশাখা। সুপ্রভা একাই এ দুঃখ পায়নি, ওর আগে অন্য মেয়েও পেয়েছে।

বিশাখা লক্ষ্য করল শেষের দিকে রমাদির গলা আর তেমনি নির্লিপ্ত নেই। কেমন যেন ধরা ধরা। বুঝি অনেকদূর থেকে অচেনা গলায় কেউ কথা বলছে। এ সেই রূঢ়ভাষী কর্তব্য সর্বস্ব নার্স রমা সেন নয়। এ যেন অন্য কেউ, অন্য জন। বিশাখার মনে হলো রমা সেন তার মুখোশ খুলে ফেলেছে যেমন খুলে ফেলে কাজের শেষে তার অ্যাপ্রণ।

রমার শেষ কথার খেই ধরে বলল বিশাখা, এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে, তুমি নিজে দেখেছ? যেন রমা না বললেই খুশী হতো বিশাখা।

হ্যাঁ, তাদের একজন ছিল আমার খুব চেনা।

সেরে গেল, তবু তার স্বামী তাকে নিয়ে গেল না? বিশাখার বিস্ময়ের আর সীমা নেই।

না, নিয়ে আর গেল কোথায়? কী করে নিয়ে যাবে বল? সে যে ততদিন আর একটা বিয়ে করেছে। নতুন করে জীবন শুরু করেছে আবার। দুঃস্বপ্নকে কে আর শখ করে বাড়ি বয়ে নিয়ে যায় বল!

তাই বলে নিজের স্ত্রী, তাকে সে ভালোবাসত—বিশাখা আর কী বলবে খুঁজে পেল না।

মেয়েটিও সেদিন তোমার মত এই কথাই ভেবেছিল—এ কী করে সম্ভব। বিয়ের পর একটা বছর তারা খুব সুখে কাটিয়েছিল। তার আগে মেয়েটি অনেক দুঃখ পেয়েছিল, তাই সুখের মূল্য জানত—কিন্তু সে অন্য গল্প। তুমি এবার শুয়ে পড়।

রমার হাত ধরে ছোট মেয়ের মত বলে উঠল বিশাখা, না, তুমি তার গল্প বল।

গল্পই বা কোথায়, নিতান্তই সাধারণ একটা ঘটনা।

তা হোক তুমি বল। বিশাখা রমার হাতে চাপ দিল।

একটু সময় চুপ করে রইল রমা সেন। তাকিয়ে আছে কি চোখ বুজে আছে, আবছা আলোয় বোঝা যায় না।

শোন তবে। ছোট বেলা থেকেই বুঝতে শিখেছে কাকার সংসারে সে বোঝা। কাকাকে তেমন দোষ দেওয়াও যায় না। অবস্থা তেমন ভালো নয়। তার ওপর অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। তবু দেখতে শুনতে ভালো ছিল বলে নিখরচায় বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েটির বয়স তখন সতের হবে। স্টেশনের লাগা ছোট বাসা। তারা দুজন আর বুড়ি শাশুড়ি। ঘরদোর গুছোতে ছেলেবেলা থেকেই খুব ভালোবাসত মেয়েটি। বিয়েব পর মনের মত করে গুছিয়ে তুলল নিজের সংসার। বাড়ির সামনে ছোট জায়গাটুকুতে ফুলের বাগান করল। পিছনে রইল সবজি ক্ষেত। রোজ প্রতিটি ফুলের গাছে নিজের হাতে জল না ঢাললে তাব স্বস্তি ছিল না। স্বামী বলত, কী দরকার এত কষ্টের। বদলির চাকরি, দুদিন পরেই আবার অন্য কোথাও যেতে হবে। তোমার সাধের ফুল বাগানে হয়তো ছাগল চরাবে পরের এ এস এম এর বউ।

মেয়েটি বলত, তা হোক, তাবলে যে কদিন থাকি একটু ভালোভাবে থাকব না!

ট্রেনে যেতে যেতে জানালা দিয়ে কতলোক তার বাগানের দিকে আঙুল দেখিয়েছে। এদিক ওদিক সব স্টেশন থেকে লোক আসত তাব বাগানের ফুল নিতে। এমন কি ত্রিশ মাইল দূর থেকে ডি টি এস-এব চাপরাসীও মাঝে মাঝে আসত মেম সাহেবের ফুলের বায়না নিয়ে।

স্বামী ঠাট্টা করে বলত, ভয় করে কোনদিনবা ওপরওয়ালার নজর ফুল ছেড়ে মালিনীর দিকে পড়ে।

মেয়েটি বলত, তোমার তো তাহলে পোয়া বারো। রাতারাতি স্টেশন মাস্টার। পুরুষরা শুনেছি চাকরির উন্নতির জন্যে সব পারে।

স্বামী হঠাৎ চটে উঠত। মেয়েটির মুখ চাপা দিয়ে বলত, দিক দেখি নজর আমার মালিনীর দিকে। তার চোখ কানা করে রেলের কোর্ট ছেড়ে দিয়ে যাব না!

মেয়েটি অবাক হবার ভান করে বলত, সত্যি বলছ। কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলে খাবে কি ?

বলত, মজুর খেটে।

মেয়েটিও নাছোড়। বলত, বটে, মজুর খেটে কত রোজ পাবে জান? তা থেকে রোজ অতগুলি সিগারেটের দাম বাদ দিয়ে চাল কিনবার পয়সা থাকবে ভেবেছ? আমি না হয় বাকল পরলাম।

উত্তর হতো, মজুররা বুঝি সিগারেট খায়? তখন বিড়ি খাব। না জুটলে তাও খাব না।

এবার হাসি ফুটত মেয়েটির মুখে। বলত, তাই নাকি, তাহলে তো এখন থেকেই কম খাওয়া অভ্যাস করা উচিত, না হলে পরে কষ্ট হবে। কাল থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বরাদ্দ, কেমন ?

এবার স্বামীও হেসে উঠত। বলত, ও এই জন্যে এত। সত্যি এ এস এম এর স্ত্রী না হয়ে তোমার উচিত ছিল উকিল হওয়া।

এই পর্যন্ত বলে রমা থামল। চোখ বুজে কী যেন ভাবল খানিকক্ষণ। বিশাখা কোন কথা বলল না। আগ্রহী দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে রইল রমার দিকে।

রমার চোখ খুলল কি খুলল না। যেন নিজের মনেই বলতে শুরু করল, কখনও কখনও ছুটির দিনে তারা কলকাতা বেড়াতে যেত। কলকাতা গেলেই রেস্টুরেণ্টে খেত। রেস্টুরেণ্টে খেতে খুব ভালোবাসত মেয়েটি। তারপর সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, দক্ষিণেশ্বর কালিঘাট। কোনদিন বা ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখে সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ি ফিরত।

দেখতে দেখতে ছমাস কেটে গেল। জীবনে যে এত সুখ এত আনন্দ আছে সতেরো বছরের জীবনে এর আগে তা জানতেই পারে নি। কাকার বহু সন্তানের সংসারে সে ছিল বাড়তি বোঝা। এমন কোন জীবনের কথা সে কল্পনাও করেনি কোনদিন। তার কিছুই ছিল না, সব হলো। তবু সেও বুঝি সব নয়। কোথায় যেন তবু একটু ফাঁক ছিল। স্বামী যখন ডিউটিতে, শাশুড়ী ঘুমে, কেমন কেমন যেন ফাঁকা লাগত বাড়িটা। কারণটা ধরা পড়তেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠত। আশে পাশে তাকিয়ে দেখত কেউ আছে কিনা, কেউ থাকলে যেন মুখ দেখে তার মনের ইচ্ছেটাকে জেনে নেবে। ঘর গুছোতে গিয়ে

কোনদিন মনে হয়েছে বারান্দার এখানে একটা দোলনা থাকলে বেশ হতো। কিন্তু পরম মুহূর্তেই আবার সেই লজ্জা। সে লজ্জাও একদিন ভাঙল। বুড়ো মানুষ শাশুড়ীকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। আশ্চর্য, এতদিন যে মানুষ সংসারের এক কোণে নিজের জপতপ নিয়ে পড়ে ছিলেন, আছেন কি নেই তাও সব সময় বোঝা যেত না, তিনিও আবার সংসারে ফিরে এলেন। উঠতে বসতে উপদেশ। এটা করতে নেই, ওটা করো না। এটা খাও, ওটা খেও না। নিজেকে নিয়ে বিব্রত হয়ে উঠল মেয়েটি। শাশুড়ীকে কিছু বললে শুনবে না। অগত্যা সে চুপ করে রইলো। কাটল পাঁচ-ছ মাস। স্বামী চেষ্টা করছিল কলকাতার কাছে পিঠে বদলি হতে। ভালো ম্যাটারনিটি হোমে সীট পাওয়া সহজ হবে তাহলে। কিন্তু তার আর দরকার হলো না।

রমার নিঃশ্বাস দীর্ঘ হলো। কথা বন্ধ হলো কিছুক্ষণ। গাছের পাতা থেকে শিশির ঝরে পড়ার মত আস্তে আস্তে বলল, কলকাতায় আছাড় খেয়ে পেটে ভীষণ চোট লাগল মেয়েটির। রক্ত দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান হলো অনেক পরে। দোলনার দরকার হলো না। আর একজনের বদলে নিজের প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু শরীর সারল না। ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হলো না। হাওয়া খেতে বাইরেও গেল একবার ডাক্তারের পরামর্শে। কিন্তু কোন ফল হলো না। মেয়েটি রাগ করে আর ডাক্তার ডাকতে দিল না। রোজই একটু একটু জ্বর হতো। খুসখুস কাশিও সেই সঙ্গে। স্বামীকে কিছু জানতে দিত না। একদিন কাশির সঙ্গে একটু রক্ত পড়ল। ভয় পেয়ে ডাক্তার ডেকে আনল ছেলেটি। ডাক্তার এসে সব শুনলেন, বুক দেখলেন, মুখ গম্ভীর করে বললেন এক্স-রে করতে।

এক্স-রে করা হলো। ডাক্তারের অনুমান ঠিক। স্বামী কেঁদে ফেলল, শাশুড়ী অদৃষ্টকে দোষ দিলেন, মেয়েটি কেবল কিছু বলল না। সে যেন মনে মনে তৈরী হয়েছিল। এরপর সীটের জন্যে হাসপাতালে ছোটাছুটি। দুতিন মাস পরে পাওয়াও গেল। তারপর একদিন তার ফুলের বাগান আর নিজের হাতে সাজান সংসার ফেলে রেখে মেয়েটি এসে হাসপাতালে উঠল।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন বাড়ির কথা ভেবে খুব মন খারাপ হতো। চারিদিকে রোগীদের দেখে কেমন ভয় ভয় করতো। স্বামী আসতেন সপ্তাহে একদিন। কলকাতায় কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না যে খোঁজ নেবে। গোটা দিন মন মরা হয়ে থাকত। কেবল দিনান্তে বুড়ো সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এলে মনটা

কেমন খুশী হয়ে উঠত। প্রথমদিন থেকেই বুড়োকে তার খুব ভালো লেগেছিল। বাবাকে তার মনেই পড়ে না। কোন ছেলেবেলায় তিনি মারা গেছেন। বেঁচে থাকলে হয়তো এই রকমই হতেন। এসে কাছে বসতেন, মাথায় হাত বুলোতেন। নানা রকম সান্ত্বনা দিয়ে চলে যেতেন। কোন কোনদিন দুতিনবার আসতেন। মেয়েরা বলত, বুড়ো কি তোমার আত্মীয়? সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিজেতো এত করে কোন রোগীর খোঁজ খবর নেয় না।

স্বামী প্রথমদিকে মাস দুতিন সপ্তাহে একবার করে আসত। প্রথম প্রথম চারটে বাজতে না বাজতেই ওয়ার্ডে ঢুকত, বেরতো ছটার পরে। পরে সব সপ্তাহে আসতে পারত না। যেদিন আসত পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটার পর। বসতে না বসতেই ছটা বেজে যেত। তারপরে একদিন হঠাৎ আরও দূরে বদলি করল তাকে। যাবার আগে দেখা করতে এলো। বলল, অনেক চেষ্টা করেছিল কাছে-পিঠে থাকতে। কিন্তু কোনমতেই হলো না। মেয়েটিব মনে হলো স্বামী তার অনেক বদলে গেছে। অনেক চেষ্টা কবেও সহজ হতে পারল না। খানিকটা অভিমানে খানিকটা হতাশায়।

প্রথম প্রথম মেয়েটি স্বামীকে বেশী আসতে বারণ কবত। বলত, এত লোকের মধ্যে আমি বেশ থাকব। তুমি আর এখানে বেশী এসো না। নিজেব শবীরের দিকে নজর দাও। কিন্তু পরে যখন স্বামী ঠিকমত দিনে আসতে পারত না তাব কান্না পেত। রাগ হতো স্বামীর ওপব। ভাবত, স্বার্থপর, স্বামী তার স্বার্থপর। কাজ না ছাই, এ শুধু তার অসুখেব ভয়। অসুখ মেয়েটিকে এমনি করে বদলে দিয়েছিল।

সেদিন স্বামী চলে গেলে মনটা তার অনেকক্ষণ ভাবি হয়ে রইল। কেন যেন মনে হলো বারান্দা পাব হয়ে আস্তে আস্তে যে লোকটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, সে বোধ হয় আর কোনদিন ফিরে আসবে না। সেই মুহূর্তেই মেয়েটির মনে হলো ওর বদলির কথা তাহলে মিথ্যে। এখানে আর আসতে চায় না তাই মিথ্যে কথা বলে গেল।

কদিন পরে সত্যি সত্যিই নতুন স্টেশনের ঠিকানা থেকে চিঠি এলো। ঠিকানা দেখে বিশ্বাস না করে পোস্টঅফিসের ছাপ লক্ষ্য করল। স্বামী তার মিথ্যে কথা বলেনি। কিন্তু এ কেমন চিঠি। নিতান্তই দায় সেরেছে, কর্তব্য পালন করেছে। নির্বিঘ্নে পৌছেছি, কেমন আছ জানিও। কেবল এইটুকু। পরের চিঠি এলো প্রায় মাসদেড়েক পর। শাশুড়ির মারা যাবার খবর নিয়ে।

চিঠিখানা দু তিনবার পড়ল। তারপর বালিশের নীচে চাপা দিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। ভাবছিল একটি মানুষ ছিল সংসারের একধারে চুপ করে, সে আর নেই। সে নিজে তো ছিল স্বামীর সংসারের সবটুকু জুড়ে, এখন নেই। তাতে কতটুকু যায় আসে। তারপরেই মনে হলো স্বামীর আর কেউ রইল না। ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। অনেক ভেবেচিন্তে সে চিঠির একটা জবাব লিখেছিল মেয়েটি। অনেক সান্ত্বনার কথা ছিল তাতে। কিন্তু অনেকদিন স্বামীর কাছ থেকে আর কোন চিঠি এলো না। মেয়েটি দুতিনখানা চিঠি লিখেছিল ব্যস্ত হয়ে। তারপর চিঠি এলো। কাজে ব্যস্ত ছিল বলে স্বামী চিঠি লিখতে পারেনি। এরপর তিনচারখানা চিঠির কোন জবাব না পেয়ে মেয়েটি চিঠি লেখা ছেড়ে দিল।

এই পর্যন্ত বলে রমা সেন থামল। বলল, তোমার হয়তো খারাপ লাগছে, রাতও অনেক হয়েছে, এবার শুয়ে পড়। ইচ্ছে থাকলে বাকীটা অন্য সময় শুনো। আর শুনবারইবা কি আছে। এ গল্পের শেষ তো চোখের সামনেই দেখলে।

না, না, তুমি বল—ছোট মেয়ের মত চেঁচিয়ে উঠল বিশাখা।

আঃ চেঁচিও না, পাশের বেডের ঘুম ভাঙবে।

লজ্জায় মুখ নীচু করল বিশাখা। বলল, ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি বল।

আজ কী হয়েছে রমা সেনের কে জানে। নটার পরে কোন রোগী যদি একটা কথা বলে আর রমা সেন যদি ডিউটিতে থাকে তাহলে নিস্তার নেই। অথচ আজ নিজেই বকে যাচ্ছে রোগীর শিয়রে বসে।

কই বল, বিশাখা মনে করিয়ে দিল।

আবার গল্পের পাঁজ তুলে নিল রমা সেন। কী বলছিলাম যেন—

মেয়েটি চিঠি লেখা ছেড়ে দিল। ছেঁড়া সুতোয় গিঁট পরিয়ে দিল বিশাখা।

হ্যাঁ, চিঠি লেখা ছেড়ে দিল। ততদিনে দুবছর কেটেছে। সে তখন সুস্থ। ফ্রি বেড পাওয়া গিয়েছিল। আর সুপারিন্টেণ্ডেন্টের চেষ্টায় সরকারী সাহায্য মিলেছিল কিছু। সবার ওপর ছিল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সজাগ চোখ। নিজে সব সময় দেখাশুনো করতেন। ঘরোয়া সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কেবলমাত্র রোগী আর কর্তব্যপরায়ণ ডাক্তার নয়। কে জানে তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন মেয়েটির অবস্থা।

যতদিন অসুখ ছিল কোন সমস্যা ছিল না। এবার সুস্থ হলে সমস্যা

দেখা দিল। অনেক অসুস্থ লোক বাইরে পড়ে আছে, বেড খালি করে দিতেই হবে।

একদিন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন, তোমার স্বামী কি অন্য কোথাও বদলি হয়েছেন? পুরনো ঠিকানায় চিঠি লেখা হয়েছিল সে চিঠি ফেরত এসেছে। নতুন ঠিকানা অফিসকে জানিয়ে দিও, তুমি নিজেও সব কথা জানিয়ে দিও তোমার চিঠিতে। আর দু সপ্তাহের বেশী তোমাকে রাখা যাবে না। কোন দরকার নেই।

মেয়েটি মুখ নীচু করে চুপ করে রইল। এ সমস্যা একদিন দেখা দেবে সেতো জানা কথা। তবু সে যখন সত্যি দেখা দিল মেয়েটি কি করবে ভেবে পেল না। যে ঠিকানা থেকে শেষ চিঠি পেয়েছিল তাই দিল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে। বলল, চিঠিটা বরং স্টেশন মাস্টারের নামে লিখুন ওর ঠিকানার জন্যে। কথাটা বলতে লজ্জায় মরে গেল মেয়েটি।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কেবল বললেন, ও!

এ সব কাজ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের করবার কথা নয়। কিন্তু মেয়েটির ব্যাপারে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিজেই আসতেন। আর এম ও আর হাউস সার্জনরা তটস্থ হয়ে থাকতো সব সময়। চিঠির জবাব এলো যথাসময়ে। স্টেশন মাস্টার লিখেছে, মেয়েটির স্বামী ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক পশ্চিমে বেড়াতে গেছে। একমাস পরে ফিরবে।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়তো অনেকটাই আঁচ করেছিলেন, কিন্তু এতটা ভাবেননি। মেয়েটিকে অফিসে ডেকে হাতে চিঠিখানা দিয়ে ওয়ার্ড ইনস্পেকশনে চলে গেলেন। ফেরার পথে আবার এলেন। বললেন, তাহলে এবার কী ঠিক করলে? হাসপাতাল তো ছেড়ে দিতেই হবে।

মেয়েটি কী বলবে। চুপ করেই রইল।

তিনি আবার বললেন, তোমার কি এমন কেউ নেই এখন যার কাছে গিয়ে উঠতে পার? কথাগুলি খুব আস্তে আস্তে বলছিলেন। জায়গা যে নেই একথা তিনিও জানতেন।

মেয়েটি আড়াই বছর আগের তার সংসারের কথা ভাবছিল। টুকরো টুকরো সব ছবি ভাসছিল চোখের সামনে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের দিকে যখন তাকাল চোখে বোধ হয় তার জল এসেছিল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন, আচ্ছা, আপাতত তুমি না হয় আমার বাড়িতেই চল। তারপরে দেখা যাবে।

মেয়েটি কী বলে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবে ভেবে পেল না। চোখের জল

এবার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। হয়তো বিব্রত বোধ করলেন একটু। ওয়ার্ডে যাবার নাম করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

দু তিনদিন পরেই হাসপাতাল ছেড়ে দিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বাড়িতে উঠল। হাসপাতালের পাশেই কোয়ার্টার্স। বুড়ো-বুড়ি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। একমাত্র ছেলে তখন বিলেতে। ডাক্তারী পড়ছিল। সে যে নিরাশ্রয় হয়ে এসেছে একথা মেয়েটিকে বুঝতেই দিল না। এখানে প্রায় এক বছর কাটল তার। নিজের কাছেই মেয়েটি কুণ্ঠিত হয়ে থাকত। এমনি করে কতদিন চলবে ? তারপর একদিন সুযোগ বুঝে বুড়োকে কথাটা বলল। সে নার্সিং শিখতে চায়। এমনি করে বসে থাকতে আর ভালো লাগে না।

বুড়ো বুঝতে পারলেন তার মনের অবস্থা। বললেন, বেশ আমি চেষ্টা করে দেখছি। তার দুতিন মাস পরেই ভর্তি হলাম ট্রেনিংএ।

হঠাৎ থামল রমা সেন। অসতর্ক মুহূর্তে কখন নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছে। ধরা পড়ার অস্বস্তি নিয়ে তাকাল বিশাখার মুখের দিকে। কিন্তু বিশাখার মুখে বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র নেই। কেবল সারামুখে কেমন একটু ম্লান হাসি ছড়ান। রমা সেনের ডান হাতটা অনেকক্ষণ থেকেই তার দু হাতে ধরা ছিল। একটু চাপ দিল শুধু। বলল, তারপর বল।

আর বলবার কী আছে! সে মেয়ের গল্প তো ফুরিয়েছে। ট্রেনিং শেষ করে এ হাসপাতাল থেকে সে হাসপাতাল। এই করে তো কাটল অনেক বছর। আমার মত অবস্থায় আরও দু তিনজনকে পড়তে দেখেছি, কিন্তু তাদের অন্য আত্মীয় ছিল। সুপ্রভার মত এমন অসহায় হতে আর কাউকে দেখিনি। ওকে দেখে আমার নিজের কথা মনে পড়ে গেল। রমা সেন জোরে নিঃশ্বাস ফেলল।

বিশাখা বলল, রমাদি—

না, আর কথা নয়। সাড়ে নটা বাজে, এবার ঘুমিয়ে পড়।

এ গলা সেই নার্স রমা সেনের। এতক্ষণের মুখোশ খোলা রমাদির নয়। বিশাখার গায়ের ওপর চাদর টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল রমা সেন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল বিশাখা। বারান্দা পেরিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে রমাদি। কেমন যেন ক্লান্ত মনে হচ্ছে। শেষ ভাদ্রের রাত। আবছা কুয়াশা নেমেছে মাঠে। খণ্ড তিথির একফালি চাঁদ দূরে গ্রামের পিছনে হেলে পড়েছে। ওর সঙ্গে একটু আগের রমা সেনের যেন আশ্চর্য একটা মিল ছিল।

বিশাখা পাশ ফিরে শুলো। সেই মুহূর্তে বিশাখার মনে হলো কাল অমলেশের আসবার কথা। কিন্তু যদি না আসে—যদি না আসে—। না, না, অস্ফুট আর্তনাদ করল বিশাখা। সাইডস্ক্রীনের ওপাশে পনের নম্বরের ঘুম ভেঙে গেল। বলল, কী হলো বিশাখা।

বিশাখার চমক ভাঙল। বলল, না, কিছু না।

ছায়াপথ

অনিমেষের চিঠি পেলাম, রাত আটটার গাড়ীতে তোমার ওখানে পৌঁছাচ্ছি। ষ্টেশনে থেক।

অনেকদিনের বন্ধু আমার অনিমেষ। একই দিনে একই টেবিলে আমাদের কর্মজীবনের সুরু। মফস্বলের মেসে পাশাপাশি সিটে কাটিয়েছি চার বছর। তারপরে ও বিয়ে করে মেস ছেড়ে বাসা করল। আরও বছর খানেক পরে পার্টিশানের ধাক্কায় এক একজন এক একদিকে ছিটকে পড়লাম। ও ডিব্রুগড় আর আমি এই কাঁচড়াপাড়ায়।

তারপর এক বছর বাদে আবার আমাদের দেখা হবে। একা মানুষ। তিরিশের সিঁড়ি পেরিয়ে এলেও বিয়ে করা আজও হয়ে ওঠেনি। ছোকরা চাকর নিতাইএর হাতে ঘরকন্না ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। ওকে ডেকে বললাম, বাজার থেকে মাংস নিয়ে আসবি আর ভালো দেখে মিষ্টি। আমার এক বন্ধু আসবে। আর দেখিস বাবা, রান্নাটা যেন ভদ্রলোকের মুখে দেবার মত হয়।

অফিস থেকে আর বাসায় ফিরিনি। দোকান থেকে চা খেয়ে এদিক ওদিক খানিকটা আড্ডা দিলাম। তারপরে সাড়ে সাতটা নাগাদ গেলাম ষ্টেশনে। যথাসময়ে ট্রেণ এলো। প্রথমে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিন্তু বৃথা। তারপর এগিয়ে গেলাম প্ল্যাটফর্ম-এ। দুএকটা কম্পার্টমেণ্টে গলা বাড়িয়ে ডাকও দিলাম। সাড়া এলো না। হেঁটে হেঁটে প্রায় সমস্ত প্ল্যাটফর্মটাই প্রদক্ষিণ করলাম। ঘণ্টা হলো। হুইসিল দিয়ে ট্রেণ ছাড়ল। অনিমেষ এলো না।

ফিরে আসছিলাম। ষ্টেশনের দরজা ছাড়িয়ে রাস্তায় নামতেই কে যেন পিছন থেকে ডাকল—অজিতদা না?

থমকে দাঁড়ালাম। গলার স্বরটা অত্যন্ত চেনা মনে হলো। ফিরে দেখলাম রিক্সা থেকে নামছে বিভূতি। এক হাতে টিনের সুটকেশ আর এক হাতে সুজনিতে জড়ান একটা ছোট বিছানা। বললাম, 'আরে তুমি এখানে কোথা থেকে? কোথায় আছ, ভালো আছ তো?'

উপর্য্যুপরি এতগুলি প্রশ্নে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল বেচারা। তারপর প্রথম জড়তা কেটে যেতেই পায়ের উপর ঢিপ করে এক প্রণাম। মাথা তুলতে

তুলতে বলল, 'আছি খড়্গপুরে। পিসিমাকে বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছিলাম। জানেন তো ছোট বেলায় মাকে হারিয়েছি। ওর কাছেই মানুষ। ভাবলাম একবার না এলে বড় কষ্ট পাবেন। তা এসে দেখি বাসায় তালা ঝুলছে। পাশের বাড়ীতে শুনলাম জলপাইগুঁড়ি গেছেন মেয়ের বাসায়। ফিরেই যাই, কি আর করি।'

বললাম, 'সেকি রাত্রে খাওয়াদাওয়ার করবে কি? তাছারা আজ রাত্রেতো আর ট্রেণ পাবে না হাওড়া থেকে।'

ও একটু বিব্রত হয়ে পড়ল বুঝতে পারলাম। লোকটি বড় লাজুক আর বোকা বোকা ধরণের। বিনা কারণে লজ্জিত হয়ে পড়াটাও ওর একটা স্বভাব।

বলল,—'না, না,—সে একরকম হয়ে যাবে। সেজন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

বললাম, 'তা এক কাজ কর। আজ রাতটা আমার ওখানে কাটিয়ে কাল দিনের গাড়ীতেই না হয় যেও।'

কথাটা ওর খারাপ লাগল না। বুঝতে পাবলাম। তবুও নেহাৎ যেন বলবার জন্যেই বলল, 'না-না আবাব আপনার অসুবিধে…'

বুঝলাম বাক্যের অবশিষ্টাংশ শেষ করতে ওর রীতিমত কষ্ট হবে। ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।'

একটা রিক্স ডেকে ওকে ইঙ্গিত কবে নিজে উঠে বসলাম।

এতক্ষণে ওর দ্বিধা ঘুচল। জিহ্বার জড়তা কাটিয়ে কথা সুরু করল।

সত্যি অজিতদা সারাটা জীবন আপনি একভাবেই কাটিয়ে দিলেন। কতদিন আর মেসের ভাত খাবেন বলুন তো? কেন দেশে কি লেখাপড়া জানা ভাল মেয়ের অভাব পড়েছে নাকি? বলেন তো কাল থেকেই লেগে যাই।

প্রসঙ্গটা ভাল না লাগলেও কথা বলতে হলো। বললাম, তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ। তবে লেখাপড়া জানা মেয়ে হলেই কি তাকে বিয়ে করা যায়, না লেখাপড়া-জানা মেয়ে ছাড়া বিযে করা চলবে না এমন কোন কথা আছে?

কথাটা বলেই ভুল বুঝতে পারলাম। এমন একটা প্রসঙ্গ উঠতে দেওয়া ঠিক হয়নি। বিভূতির মুখখানা দেখলাম একবার রাঙ্গা হয়েই তারপর কেমন ম্লান হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ শেষ করবার জন্য বললাম, 'আসলে ব্যাপার কি

জান, সংসারী হওয়া আমার ধাতে সইবে না। তার চেয়ে এই বেশ আছি, না কি বল ?'

ও একটু হাসল।

সারাপথ আর বিশেষ কোন কথা হলো না। একটা গুমট অস্বস্তির পর বাসায় এসে রিক্স থেকে নেমে মুক্তি পেলাম।

লেখাপড়া জানা মেয়ে নিয়ে ওর জীবনে একটা করুণ কাহিনী আছে। তাই ওরই নির্বুদ্ধিতার জন্য কথাটা উঠতে আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম।

বিভূতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় সৈয়দপুরে। যেখানে পরিচয় হয়েছিল অনিমেষের সঙ্গে। আমি তখন এ-আর-পির হেড্ ক্লার্ক। পদটা অস্থায়ী হলেও মাইনে কিছু বেশী। সহকর্মীদের ঈর্ষান্বিত করে অফিসরের নেকনজরে কি করে যেন পদাধিকারটা আমাকেই অর্সাল।

এই নতুন অফিসেই পরিচয় বিভূতির সঙ্গে। এ-আর-পির ওয়ার্ডেন। শাদা মাঠা সরল ছেলেটি। দেখতে একটু বোকা-বোকা। চাউনিতে সেই বোকামি মিশ্রিত সারল্যের ছাপ। ওকে আমার কেমন যেন ভাল লেগে গেল। দেখে মনে হতো এ পবিবেশে ওকে ঠিক মানায না। ষ্টীল হেলমেট, ভারি বুট আর বেগুনী সার্ট প্যাণ্টে ও যেন বড় বেশী বেখাপ্পা, বেমানান। এ চাকরিতে যে আটপিঠে চোযাড়েপনাব প্রয়োজন ওব মধ্যে তার বড় বেশী অভাব।

একটু বোকা হলেও ওর সঙ্গে আমাব ব্যবহাবে যে একটু প্রশ্রয়ের আভাস ছিল প্রথম থেকেই তা কি কবে বুঝে ফেলল। সেটা আরও প্রকট হলো একটা একৃষ্ট্রা এ্যালাওন্সের ব্যাপাবে ওকে বঞ্চিত করা হলে আমি নিজে ওর জন্য অফিসরের কাছে সুপারিশ করে পাঠালাম। আব সেই জোরেই টাকাটা ও পেয়ে গেল।

সেই থেকে বিভূতি আমাকে তার অভিভাবকের আসনে বসিয়ে দিল।

পরদিন সন্ধ্যার পর রুমাল দিযে ঢাকা একখানা রেকাব নিয়ে মেসে গিয়ে হাজির।

বললাম, 'ওতে কী ?'

কী যে তা আমি বুঝেছিলাম। আর বুঝে সত্যিই রাগ হয়েছিল। মানুষগুলো যে কী! ওর ন্যায্য টাকা পাইয়ে দিয়েছি তার জন্যেও ভেট। আমার রাগের কিছুটা আভাস বোধ হয় কথাতেই পাওয়া গিয়েছিল। বেচারা একেবারে মুষড়ে পড়ল।

বলল, 'আমি বলেছিলাম যে এ আপনি কিছুতেই নেবেন না। আমি তো চিনি আপনাকে। কিন্তু মায়া—আমার স্ত্রী কিছুতেই শুনল না। বলে, আমি তো জানি ও টাকা যাদের সার্ভিস রেকর্ড ভাল শুধু তাদের জন্তেই। তোমার রেকর্ড তো ভাল নয়। তবু যে টাকা পেলে সে কেবল ওর জন্তে। মায়াই পাঠিয়ে দিয়েছে। না নিলে—'

বললাম, 'না নিয়ে যাও আর কখনও এ সব করবে না।'

সুদৃশ্য কারুকাজ করা ফুলকাটা রুমালে ঢাকা রেকাবখানা নিয়ে ও ঘুরে দাঁড়াল। দেখলাম ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। বোকা-বোকা চোখ ছুটোর শাদা জমিন চিক চিক করছে। নিজের রূঢ়তায় লজ্জিত হলাম। কিন্তু তখন আর কিছু করবার নেই।

ও যখন ঘর ছেড়ে গেছে অনিমেষ বলল; 'কিন্তু এটা একটু বাড়াবাড়ি হলো নাকি?'

তাতে কি আর আমারই সন্দেহ ছিল। কিন্তু…

'ওকে ডাক। ওর খুব শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু এবারের মত ওগুলো নাও।'

আমার কথার অপেক্ষা না রেখে অনিমেষ নিজেই ডাকল, 'শুনুন।'

বিভূতি ফিরে দাঁড়াল।

'আমাকে ডাকছেন?'

হ্যাঁ, এবারকার মত আপনাকে ফিরিয়ে দিলাম না। কিন্তু ও যখন এ সব পছন্দ করে না তখন নাইবা করলেন।

বিভূতি কৃতার্থ হয়ে গেল। রেকাবখানা টেবিলের উপর রেখে বলল, 'আমি কাল এসে এখানা নিয়ে যাব।' তারপর বিনিতভাবে নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

এর প্রায় মাসখানেক পর বাবার মৃত্যুতিথিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করল বিভূতি।

বললাম, 'সে কি, আমি তো ব্রাহ্মণ নই। আর এ সব ব্যাপারে তো ব্রাহ্মণ খাওয়ানই নিয়ম।'

'আমি সে কথা বলেছিলাম। কিন্তু মায়া—'

আবার মায়া। মনে মনে রাগ হলো। কোথায় যেন হোঁচট খেলাম। সন্দেহ হলো ওর সারল্যে। বারে বারে মায়ার কথা উল্লেখ করে কেন আমার কাছে। পরে বুঝেছি আমার সন্দেহ অমূলক। আসলে বিভূতি দুর্বল। নিজের

কথাটাকে নিছক বলে চালাবার সাহস নেই তাই খুশিমত মায়াকে টেনে আনে।

শেষ পর্যন্ত নিমন্ত্রণে সম্মতি দিলাম। তা ছাড়া এই মেয়েটিকে দেখবার একটা অদম্য কৌতূহলও ছিল আমার মনে। বিভূতির মারফত তার যতটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতে রীতিমত বুদ্ধিমতী বলেই মনে হয়েছে। আর সেই খাবার ঢাকা দেওয়া রুমালের সূচীশিল্পে দেখেছিলাম একটি মার্জিত সুকুমার শিল্পী মনের পরিচয়। অবশ্য সে রুমাল যে বিভূতির স্ত্রীর হাতেরই তেমন কোন প্রমাণ না থাকলেও এটাকে আমি অভ্রান্ত বলেই ধরে নিয়েছি।

নিমন্ত্রণের দিন একটু আগে আগেই পৌঁছেছিলাম। বিভূতি শশব্যস্তে অভ্যর্থনা করল। 'এই যে দাদা' আপনি এসে গেছেন। আপনার কথাই বলছিলাম এতক্ষণ।

লক্ষ্য করলাম ও এই প্রথম আমাকে দাদা বলল। আর এই পরিবেশে সম্বোধনে আত্মীয়তার সুরটুকু বেশ লাগল আমার। আমাকে ঘরে নিয়ে বসাল। খোলার ঘর, দেয়াল মেজে পাকা। একদিকে তক্তপোষে পরিচ্ছন্ন বিছানা। ছোট্ট একটি গোল টেবিলের ওপর সুন্দর ধবধবে ঢাকনি। টেবিলের ওপর একটি ক্যালেণ্ডার, দুটো একটা প্রসাধনের টুকিটাকি, দোয়াত-কলম, একটি রাইটিং প্যাড্। পরিপাটি করে গোছান। মনে হয় একখানি সুনিপুণ হাতের স্পর্শ ওদের সর্বাঙ্গে লেগে আছে। বিছানার ওপর পড়ে আছে ফ্রেমে আঁটা বড় একখণ্ড শাদা কাপড়। তার এক কোণে পেন্সিলে আঁকা অর্ধসমাপ্ত একটা প্যাটার্ণের বুকে সুঁচ ফোটান। মনে হলো হয়তো আমি আসবার আগ পর্যন্তও ওতে কাজ চলছিল। ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ সেই সুনিপুণ হাতের গৃহিণীপনার পরিচয়।

কিছুক্ষণ একথা সেকথা হলো।

একসময় বললাম, 'আমি বোধ হয় একটু আগেই এসে পড়েছি, না বিভূতি ?'

ও বিব্রত হল। বলল, 'না—না সে কি কথা। আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন। মায়াও তাই বলছিল আপনি হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বেন। দাঁড়ান, ওকে ডেকে আনি।'

একটু পরেই ফিরে এলো বিভূতি। পিছনে সেই মেয়েটি যাকে ঘিরে আমার এত কৌতূহল। দেখলাম। ঋজু, নম্র, দোহারা। চোখ দুটি আপাতদৃষ্টিতে শান্ত স্নিগ্ধ মনে হলেও কোথায় যেন একটা চাপা বিদ্রোহের আঁচ লুকিয়ে আছে বোঝা যায়।

বিভূতি বলল, 'ইনিই অজিতদা। প্রণাম কর।'

আমি বিপদে পড়লাম। বললাম, 'না, না প্রণাম করতে হবে না।'

ও বেলোয়াড়ি চুরি আর শাখাপরা দুটি হাত জোড় করে সপ্রতিভ নমস্কার করল। বলল, 'ওর কাছে আপনার কথা এত শুনেছি। ও তো বলতে গেলে আপনাকে দেবতার মতই ভক্তি করে।'

আমার বেশ অস্বস্তি লাগল। কেমন যেন স্তোকের মত শোনাচ্ছিল কথাগুলো। কিছু একটা বলা উচিত। বললাম, 'না, না সে কি কথা। ওকে আমি স্নেহ করি। কিন্তু তাই বলে····· আর কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ চোখে পড়ল বিছানার ওপর ফ্রেমে আঁটা কাপড়ের টুকরোটার দিকে। তাড়াতাড়িতে ওটাকেই আঁকড়ে ধরলাম মধুসূদন বলে, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বললাম, 'ওটা কী করছেন, টেব্‌ল্ ক্লথ বুঝি? বাঃ বেশ হচ্ছে তো।'

ওর মুখে কেমন গর্বমিশ্রিত লজ্জার লাল ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু আর কি কথা বলতাম জানি না। বাঁচিয়ে দিল বিভূতি।

'বাঃ ওর ক্ষিদে পায় না! এবার খেতে দাও। তার পরে না হয় গল্প করো।'

বিভূতিকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। বললাম, 'সত্যি, বিভূতি ঠিক কথাই বলেছে। আমাকে আবার একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

ফিরবার পথে হয়তো বিভূতির জন্য একটু ঈর্ষা হয়েছিল। ভেবেছিলাম ওদের এই বিয়ে কি সুখের হয়েছে! কি দিতে পারবে ওকে বিভূতি! কি আছে ওর! যদিও সব মিলিয়ে মেয়েটিকে আর তিন চার বারের বেশী দেখিনি। আর তাও ওই একটু ক্ষণের জন্যে। কথাও হয়েছে সামান্যই। তবুও আমার মনে একটি সশ্রদ্ধ আসন ওর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

কিন্তু সমস্যা এলো অপ্রত্যাশিত ভাবে। আমার নয়। বিভূতির, আর ওরই মত আরও অনেকের। যুদ্ধ জয় সমাপ্ত। জাপানের দম্ভ চূর্ণ হয়েছে হিরোসিমা আর নাগাসাকিতে। তার ধাক্কা এসে লাগল যুদ্ধের জন্য সৃষ্ট এই অস্থায়ী বিভাগগুলোতেও। আদেশ এলো, এ. আর. পি. ডিসব্যাণ্ড করে দাও। আমি ফিরে গেলাম অনিমেষের পাশে, পুরানো টেবিলে।

বিভূতি ভেঙে পড়ল, 'দাদা, এবার কি হবে?'

বললাম, 'আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি কি করা যায়।' যেন ওর জন্যে কিছু করবার দায় একমাত্র আমারই ঘাড়ে।

ধরপাকড় করে ওকে ঢুকিয়ে দিলাম কারখানায়।

মাস কয়েক পরে একদিন রাত্তিরে বিভূতি আমার কাছে এসে হাজির।

'দাদা, ম্যাট্রিকুলেশনের বই জোগাড় করে দিতে পারেন ?'

বললাম, 'কেন, পরীক্ষা দেবে নাকি ?'

বুড়ো আঙুলে মাটি খুড়তে খুড়তে মুখ নীচু করে একটু হাসল বিভূতি। সেই অমায়িক লাজুক হাসি। একবার মাথা চুলকাল। বলল, 'না, আমার দ্বারা ওসব হবে না। আর সময়ই বা কোথায় ?'

মায়া দেবে। ঢোক গিলে আবার বলল, 'জানেন, বিয়ের আগে ক্লাস টেন অবধি পড়েছিল। এমন সময় বাবা মারা গেলেন। অবস্থাও তেমন ভাল নয়। আর পড়া চলে না। কাকা বিয়ে দিয়ে দিলেন।'

কথাগুলো এমন ভাবে বলল বিভূতি যেন মায়াকে বিয়ে করে ও এক মহা অপরাধ করে ফেলেছে।

বললাম, 'আচ্ছা দেখি। অনেক ছেলেইতো এখানকার স্কুল থেকে পরীক্ষা দেবে। আমার জানাশোনাও আছে দু'এক জন।'

এক সহকর্মীর ভাইএর কাছ থেকে জোগাড় করে দিলামও।

মাস কয়েক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ফিরতে রাত হতো। ঠাকুর বলেছে এব মধ্যে দিন কয়েক এসে ফিরে গেছে বিভূতি। সে দিন দেখা হলো রাস্তায়। বললাম, 'কি বিভূতি, বৌমা পড়াশুনো করছেন ?'

বলল, 'হ্যা। পড়াশুনোর সুবিধের জন্যে ওকে ওর কাকার কাছে আসানসোলেই পাঠিয়ে দিলাম। নিজে থেকেই বলছিল। আর আমিও দেখলাম তাই ভাল। এখানে সংসারের কাজকর্ম করে কি আর ও সব হয়। ও হলো গিয়ে আপনার আয়াসের জিনিষ।'

'কিন্তু এখানে তোমার খাওয়া দাওয়া'……

'সে জন্য আবার একটা ভাবনা। সে দু'বেলা চারটি নিজেই ফুটিয়ে নিতে পারব। গরীবের ঘরে পড়েছে কোন সাধ আহ্লাদইতো আর মিটল না। তা—এটা যখন সাধ্যে কুলোচ্ছে—'

আমি আর কিছু বললাম না। বিভূতির কথা শুনে নিজেকে অত্যন্ত স্বার্থপর বলে মনে হলো। বেশ একটু লজ্জিতই হলাম।

এর পরে মাঝে মাঝে দেখা হতো। অফিসে কি রাস্তায়।

সেটা বোধ হয় ফেব্রুয়ারী মাস। সন্ধ্যার পরে বিভূতি এসে হাজির।

'কি খবর বিভূতি ?'

'একটা দরকার ছিল।' বলে কুণ্ঠিতভাবে মাথা চুলকাল।

'বলই না কি ব্যাপার।'

'ঘোষ সাহেব চার্জসীট দিয়েছেন।' ঘোষ সাহেব ওদের চার্জম্যান। বললাম, 'কেন ?'

'পর পর চার দিন টিফিনের আগে আগে বেরিয়ে এসেছি বলে।'

'কেন, আগে এসেছ কেন ?'

'কয়েক দিন থেকেই একটু একটু জ্বর হচ্ছে শেষ রাত্তিরে। উঠতে বেলা হয়ে যায়, রান্না করে যেতে পারি না। ওদিকে একটু আগে না বেরুলে রান্না খেয়ে বিকেলের সিফ্‌টে যেতে পারি না।'

বললাম, 'তা এখনতো বৌমার স্কুল ছুটি, টেষ্ট হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে আসনা কেন ?'

এবার ও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। বলল, 'সামনেই পরীক্ষা। এখন এলে পড়াশুনোর ক্ষতি হবে। তাই লিখেছে আমি যেন কোন রকমে চালিয়ে নিই।'

একটু থামল। তারপর আবার বলল, 'আপনি যদি একটু বলেন ঘোষ সাহেবকে।'

বললাম, 'আচ্ছা যাও। আমি বলে দেব। কিন্তু এরকম কবে কতদিন চলবে ?'

মাঝে মাঝে দেখা হয় ওর সঙ্গে অফিসে। কখনও আসে আমার মেসে। 'পিসীমা নাড় পাঠিয়েছে রেখে দিন। পিস্‌শাশুড়ী ক্ষীরের ছাঁচ পাঠিয়েছে খেয়ে দেখবেন।' যে দিন দেখা পায় না এটা ওটা ঠাকুরের কাছে রেখে যায়। আগে রেখে যেত অনিমেষের কাছে। কিন্তু ও এখন বিয়ে করে বাসা করেছে।

এক দিন বললাম, 'বৌমা কেমন আছেন, চিঠিপত্র পাচ্চতো ঠিক মত ?'

প্রশ্ন করে মনে হলো ওকে যেন বিব্রত করলাম। আমতা আমতা করে বলল, 'না—কি জানেন, পরীক্ষা সামনে। একেবারেই সময় নাই কিনা তাই— আর তা ছাড়া খবর ঠিকই পাই ওখানকার একটি ছেলে আমাদের শপে কাজ করে। ওর বাড়ীর চিঠিতেই খবর আসে।'

কেমন যেন লাগল। সে কি রকম কথা! পরীক্ষা সামনে বলে স্বামীর কাছে একখানা চিঠি লিখবার সময় পায় না!

সেকশনের 'পাশ'গুলো আমার হাত দিয়েই ইস্যু হয়। সে দিন দেখলাম

বিভূতির নামে 'পাশ' লেখান হয়েছে। আসানসোলের। ক্যালেণ্ডারে দেখলাম মে মাস। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হয়ে গেছে।

বিভূতি এক দিন নিজের থেকে এসে জানিয়ে গেল মায়াকে নিয়ে এসেছে। পরীক্ষা ভালই দিয়েছে। একরাশ খাবার রেখে গেল আমার জন্য। শ্বশুর বাড়ীর। বিভূতির শরীরটা খারাপ হয়ে পড়েছিল। বললাম, 'এবার একটু বিশ্রাম নিয়ে শরীরটাকে সারিয়ে তোল।'

ও হাসল। সেই আকর্ণবিস্তৃত সরল হাসি।

মাঝে মাঝে ওদের কথা ভাবতাম। বেশ আছে। পরিতৃপ্ত জীবন। বোকা হলেও মায়া যে ওর ঘরে দুর্লভ রত্ন তা কি করে ঠিক বুঝে ফেলেছে বিভূতি।

একদিন রাত্তিরে বিভূতি এসে হাজির। সারা মুখ থমথমে। চোখ দুটো লাল, ফুলো ফুলো। মুখে নেই সেই চির পরিচিত সরল হাসিটি। দেখে কেমন অস্বস্তি লাগল। মেসে ফিরে শুনেছি আরও দু তিন বার এসে ফিরে গেছে বিভূতি।

বললাম, 'কি বিভূতি, ব্যাপাব কি ? ওরকম দেখাচ্ছে কেন, অসুখ করেছে ?'

ও কোন কথা বলল না। মনে হলো সারা অঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। ঠোঁট কামড়ে চেষ্টা করেও তা থামাতে পারল না। হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ল।

আমি হতবাক! এতদিনের পরিচয় বিভূতির সঙ্গে, বলতে গেলে ওর নাড়ি নক্ষত্র আমার নখদর্পণে। জানি ও দুর্বল লাজুক স্বভাবের লোক। কিন্তু আজকের এ ব্যবহার একেবারে অপ্রত্যাশিত।

কিছুক্ষণ পরে কান্না চেপে বলল, 'দাদা, আমার সর্বনাশ হয়েছে।'

আবার কান্নার দমকে কাঁপতে লাগল।

এবার আমি বিরক্ত হলাম। একটা শক্ত সমর্থ লোককে এমনি করে কাঁদতে দেখলে আমার সত্যিই বিরক্তি হয়। কড়া সুরে বললাম, 'কান্না থামিয়ে যা বলবে বল।'

ধমক খেয়ে ও একটু হক্‌চকিয়ে গেল। ঠিক এর জন্য হয়তো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ফল ভালোই হলো। কান্নার দমক থিতিয়ে এলো। তারপর স্বাভাবিক ভাবে যা বলে গেল তার সারমর্ম এই—মায়া প্রতারণা করেছে। মন দেয়ানেয়া হয়েছিল বিয়ের আগে। বিয়ের পরেও ভুলের পলি পড়েনি তার ওপর। ছেলেটি তখনও পড়ছে। বাড়ীর অবস্থাও ভাল নয়। তাই ভবিতব্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু মন যখন আর কিছুতেই টিকল না তখন

গেল আসানসোল। আবার দেখা হলো ছেলেটির সঙ্গে। এই জন্যেই আসতে চাইত না এখানে। আসলে, বিভূতি এখন বুঝছে, পড়াটা একটা ছল। বিভূতির শপের সেই ছেলেটি মাঝে মাঝে ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু বোকা বিভূতি বোঝে নি। অথবা বুঝলেও বিশ্বাস করে নি। পরীক্ষা চুকে যেতেই নিয়ে এসেছে।

মনে হয়েছে মায়া সেই মায়াই আছে।

কিন্তু সব পরিষ্কার হয়ে গেছে আজ। বিকেলের সিফটে কাজ করতে করতে কি করে হঠাৎ আঙুলের খানিকটা কেটে যায়। ফার্স্ট এইডের পর ছুটি মিলে গেল। মায়া তখন ঘুমুচ্ছে। সামনে খোলা প্যাডের ওপর অর্ধসমাপ্ত একখানা চিঠি। কি কৌতূহল হল বিভূতির তুলে নিয়ে পড়তে সুরু করল। কিন্তু না পড়লেই বুঝি ছিল ভাল। যাকে এতদিন দুধ কলা দিয়ে পুষেছে দেখা গেল সে কাল সাপ। ওর তখনকার রক্তহীন মুখের কথা কল্পনা করতে পারি আমি।

চিঠি লিখছিল সেই ছেলেটিকে, নীতিশ যার নাম। লিখেছে এ জীবন আর সে বইতে পারছে না। এ অভিনয় অসহ্য। আর কতদিন। নীতিশের চাকরী হয়েছে। পাশ করে গেলে মায়াও একটা কিছু জুটিয়ে নিতে পারবে। নীতিশ যেন আব দেরী না কবে। আর তা ছাড়া........এই খানে ঢোক গিলল বিভূতি। বলল, 'এখানটা আর আমি বলতে পাবছি না। আপনি পড়ে দেখুন।'

জামার পকেট থেকে সুদৃশ্য একখানা রঙের কাগজ বের করল বিভূতি। কিসের যেন একটা মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

বললাম, 'না, থাক। যদি বলবার মত না হয় নাইবা বললে।'

'না না আপনাকে না বলে কিছুতেই শান্তি পাব না আমি।'

বলতে কি আগাগোড়া জিনিষটা আমার অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। অশোভন আর অশ্লীল। অনেক বাধা দিয়েছি। কিন্তু হাত ধরে কেঁদে পড়েছে হাউমাউ করে। একটা 'সিন' এড়াবার জন্যেই অগত্যা এতক্ষণ শুনছিলাম। কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছিল সব কিছুই যেন শালিনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

যে জায়গাটা ও বলতে পারছিল না, চিঠি থেকে পড়ল। ভাষাটা এই রকম —আর তা ছাড়া তোমার সন্তান—এখানে আমি বাধা দিলাম, থাক হয়েছে। চিঠি বন্ধ করে ও খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

তারপর বলল, 'কিন্তু আমি এখন কী করব তাই বলুন। ভেবেছিলাম খুনই করে ফেলব। ঘেন্না ধরে গেছে মেয়ে মানুষের ওপর। বিয়ের সময় পিসীমা

রাগ করেছিলেন। বলেছিলেন লেখাপড়া জানা মেয়ে ঘরে আনিস না। তা গুরুজনের কথা তখন পায়ে ঠেলেছি। অথচ ওর জন্যে আমি কি না করেছি বলুন।'

আবার ও ফুঁপিয়ে উঠল। কিন্তু এবার আর আমি ওর কান্নায় বিরক্ত হতে পারলাম না। এরকম সমস্যায় পড়তে হবে কোন দিন ভাবিনি। বললাম, 'এ তোমাদের দুজনের ব্যাপার। আমার বলবার কিছুই নেই। তবে পাগলামি করে কিছু একটা করে বস না।'

কিছুক্ষণ বসে থেকে একসময় ও উঠে গেল। পরদিন আবার 'পাশ' লেখান হল দেখলাম বিভূতির নামে। সৈয়দপুর টু আসানসোল উইথ ওয়াইফ। বলা বাহুল্য, ফিরে এসেছে একা।

মাস চার পাঁচ কেটে গেছে। এখনও মাঝে মাঝে ও আমার খোঁজ খবর নেয়। দেখা হলে জিজ্ঞাসা করি কেমন আছ? এই পর্যন্ত। কোথায় যেন একটা বড় রকমের ফাঁক পড়ে গেছে বুঝি।

সেদিন ক্লাব থেকে ফিরতে একটু রাত হয়েছিল। ফিরে দেখি ঘর খোলা। আলো জ্বলছে। চাবি থাকে ঠাকুরের কাছে। কিন্তু ঘরে এলো কে? ঢুকে দেখলাম ঘরে বসে বিভূতি আর প্রৌঢ়া এক বিধবা ভদ্রমহিলা।

বিভূতি বলল, 'পিসীমা। কাল এসেছেন। কিছুতেই ছাড়লেন না। আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

বললাম, 'তা ওকে এত রাত করে নিয়ে এসেছ কেন? আমাকে জানালেই তো পারতে।'

'তাতে কি হয়েছে বাবা।' কথা বললেন পিসীমা। 'তুমি তো আর পর নও। তোমার কথা সব শুনেছি বিভূতির মুখে।'

'তা কী মনে করে?' প্রশ্ন করলাম বিভূতিকে। ব্যাপারটা কেমন কেমন ঠেকছিল।

বিভূতির আগে কথা বললেন পিসীমা, 'তুমি তো সবই জান বাবা। সর্বনাশ যা করবার তাতো সে হতভাগী করেই গিয়েছে। আর তার ফল কি হলো? ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। শেষ অব্দি হতে তো হলো আত্মঘাতী। না ঠাঁই দিলে তোর মনের মানুষ!

আমি চমকে গেলাম। খবরটা নতুন। সেই মেয়েটি—সেই ঋজু, বলিষ্ঠ মেয়েটি, যার চোখে লুকোন ছিল বিদ্রোহ, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করল!

কিন্তু পিসীমার কথা শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। দেখলাম বিভূতিও লজ্জিত হয়ে পড়েছে। একটু কড়া সুরে বললাম, 'ওকথা থাক। কি বলবেন বলুন।'

'হ্যাঁ বাবা, কাজ কি আমাদের ওকথায়। তুইতো গেলি তোর কপাল নিয়ে। কিন্তু তাই বলে আমার এমন সোনার চাঁদ ছেলে কি বিবাগী হয়ে যাবে? তুমিই বল বাবা। তোমার কথা ছাড়া ও আর কারও কথাই শুনবে না। এবার মেয়ে আমি নিজে দেখেছি। বলতে গেলে আমার হাতেই মানুষ। জ্ঞাতি ভাসুরের মেয়ে। তা ও বলছে, এপথে আর নয়। তুমিই বল বাবা বয়েসের ছেলের এসব মতিচ্ছন্ন না?

এতক্ষণে সব বোঝা গেল। মাটির হাঁড়ি সব কটা সমান হয় না। একটা না হয় লোকসানি কিন্তু তাই বলে কি লোকে হেঁসেলের পাট চুকিয়ে দেয়? যুক্তি অকাট্য। বললাম, 'ও যা ভাল বোঝে করবে। এর মধ্যে আর আমাকে জড়াবেন না।'

যা ভাল বুঝেছে তাই করেছে বিভূতি। বিয়ে করেছে সেই মেয়েকেই। বৌভাতে নিমন্ত্রণ করেছিল। শরীর খারাপের অজুহাতে যাইনি। কি যেন একটা কিনে পাঠিয়ে দিয়াছিলাম মনে নেই। শুনেছি এ বৌ লেখাপড়া একদম জানে না। আর তাই শুনেই শেষ পর্যন্ত মত দিয়েছে বিভূতি।

তারপর দেশ ভাগ হয়ে গেল। এক এক জন এক এক দিকে ছিটকে পড়লাম।

খেতে খেতে কথা বলল বিভূতি।

'যাই বলুন দাদা, এই যে এত তেল মশলা খরচ করে রেঁধেছে ব্যাটা কিন্তু সে স্বাদ ওর হাতে উটবে কি করে!'

আবার বুঝি সেই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। তাড়াতাড়ি অন্য কথা পারলাম। জায়গা কেমন খড়্গপুর। কেমন মাছ তরকারী পাওয়া যায় ইত্যাদি।

খাওয়া শেষ করে টেবিলের দুদিকে দুটো চেয়ার নিয়ে বসলাম দুজনে। হঠাৎ ঝুঁকে পরে টেবলক্লথের কোনটা উঁচু করে তুলে ধরল বিভূতি। খানিকক্ষণ এপিঠ ওপিঠ করল। কোনের ফুলের ওপর চোখ বুলাল, হাত বুলাল।

প্রথমে আমি অবাক হয়েছিলাম। তারপরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে বড় অস্বস্তি হলো। বাঘের ভয়ের সঙ্গে সন্ধ্যার যোগাযোগের অতিপ্রচলিত বাংলা প্রবাদটা মনে এলো একবার।

এটা সেই টেব্‌ল্‌ ক্লথ যা বিভূতির বাড়ীতে প্রথম দিন গিয়ে ক্রেমে আঁটা দেখে প্রশংসা করেছিলাম। পরে একদিন বিভূতিই ওটা আমাকে দিয়ে যায়। বলেছিল, 'আপনার ভাল লেগেছে তাই মায়া এটা আপনাকেই প্রণামী দিল।'

এতদিন বাক্সেই পড়েছিল, অনিমেষ আসবে বলে কি খেয়াল হলো ওটাকে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিলাম। কিন্তু কে জানতো আজ আসবে বিভূতি!

খানিকক্ষণ উস্‌খুস্‌ করল বিভূতি। শেষে বলল, 'একটা কথা বলব?'

'বল।'

'এই টেবিল ক্লথটা আমাকে দেবেন? ওঁর এতটুকু জিনিষও আর নেই আমার কাছে। রাণী, আমার এ পক্ষের বৌ, সব পুড়িয়ে দিয়েছে। বলে কি জানেন, হতভাগীকেও নিজের হাতে উনুনে ঠুসে দিতে পারলে ঝাল মিটত।'

শেষ দিকে ওর স্বর কেমন ভিজে ভিজে মনে হলো। বললাম, 'কিন্তু রাণী পুড়িয়ে ফেলবে না?'

ম্লান হাসল বিভূতি।

'বলব, তোমাব জন্যে কিনে নিয়ে এলাম।'

সেই হাসিটুকু সারা মুখে কান্নাব পোঁচ মাখিয়ে দিল।

আরে, আমাদের বিকাশ না? সরকারী বাস তখন ল্যান্সডাউন রোড ছাড়িয়ে সারকুলার রোডে পড়েছে। হাতের টিকিট দুটো পাঞ্চ করে এগিয়ে দিচ্ছিল। এমন সময় ডাক। বিকাশ ঘুরে দাঁড়াল।

এরকমটা এই প্রথম নয়। সরকারী বাসে কণ্ডাকটরের চাকরি নেবার পর থেকে এরকম অনেক লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে। কারও সঙ্গে চার বছর কারও সঙ্গে বা আট দশ বছর পরে দেখা। প্রথমে সে চিনতে পারেনি অনেককে।

কিন্তু আজ পিছন ফিরে বনমালী চৌধুরীকে চিনতে ভুল হলোনা। চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। চোখের কোনে কালি। মাংসল গালদুটো আর চওড়া কপালে স্পষ্ট বলিরেখা। একমাথা ঘন কালো চুল এখন পাতলা হয়ে এসেছে। কাঁচাপাকাচুলের মাঝখানে একফালি হাল্কা টাক প্রথমেই চোখে পড়ে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে চেহারার। তৈলচিক্কণ স্বাস্থ্য এখন যেন পোড় খেয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু প্রথম দর্শনেই তাকে চিনতে পারল বিকাশ। লীলার বাবাকে চিনতে ভুল হবার কথা নয়। হলোইবা ছ বছব পরে দেখা।

ডানহাতে বিলি· কেটে ভিড় সরিয়ে এগিয়ে এলো বিকাশ। কাঁধের ওপর ঝুলন্ত ব্যাগটা সামলে নীচু হয়ে প্রণাম করল বনমালী চৌধুরীকে। বলল, বনমালী কাকা, আপনি! আপনারাও কি কলকাতা এসেছেন নাকি?

থাকবার কি আর উপায় আছে বাবা। বাধ্য হয়েই আসতে হয়েছে।

খুড়িমা কোথায়?

সবাই এসেছি। কোথায় আর থাকবে বল? সব কিছুই ছেড়ে আসতে হল।

কতদিন এসেছেন কলকাতায়?

তা প্রায় বছর ঘুরে এলো। কী অসুবিধেয় যে আছি!

বাস ততক্ষণে বৌবাজারের মোড়ে এসে পড়েছে। বনমালী চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, আমাকে তো এখানেই নামতে হবে। তুমি বরং আমাদের বাসাতেই এসো। তোমার খুড়িমা কত খুসি হবেন। তিন নম্বর

মহিম বোস স্ট্রীট, বেলেঘাটা। যেয়ো কিন্তু অবশ্য। বনমালী চৌধুরী পাদানি ছেড়ে রাস্তায় পা রাখলেন।

ট্রিপের বাকী পথটা আনমনা হয়ে রইল বিকাশ। ডিউটি শেষ করে হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে যখন রাস্তায় বেরল তখনও কিন্তু সেই বিকেলে একবার মাত্র শোনা ঠিকানা ভুল হয়নি। আরও আশ্চর্য, ধীরে ধীরে কখন বনমালী চৌধুরীর বলিলাঞ্ছিত মুখ মিলিয়ে গিয়ে সেখানে অন্য কারও সুকুমার একখানি মুখ ভেসে উঠেছে। অথচ এই পাঁচ বছর কি লীলার কথা একবারও মনে পড়েছে? বনমালী কাকা যখন বাস থেকে নেমে যান তখনই একবার ইচ্ছা হয়েছিল জিজ্ঞাসা করবে লীলার কথা। সে কেমন আছে, কোথায় আছে। কিন্তু পারেনি। রাজ্যের সঙ্কোচ এসে গলাটিপে ধরেছে। এমনি সঙ্কোচে আরও একদিন আচ্ছন্ন করেছিল তাকে। কিন্তু সেদিন বিকাশ তাকে জয় করেছিল। রাশভারী ধনী মহাজন বনমালী চৌধুরীকে তো সে বিনা দ্বিধায় বলতে পেরেছিল, আমি লীলাকে বিয়ে করতে চাই।

কিন্তু চালাক লোক বনমালী চৌধুরী। বিবেচক লোক। বিকাশের কথা শুনে' চটে উঠে হৈ চৈ করেননি। কেবল অল্প একটু হেসে বলেছিলেন, তুমি এখনও ছেলেমানুষ বিকাশ, বড় হয়ে আগে মায়ের দুঃখ দূর কর।

সেই রাত্রেই লীলার মাকে সব খুলে বললেন বনমালী চৌধুরী। আর আফশোষ করলেন, এতদিন লীলার বিয়ে না দেওয়া আমাদের ভুল হয়েছে রাঙাবৌ। যে করেই হোক এই মাসেই আমি লীলার বিয়ে দেব।

লীলার মার কিন্তু অমত ছিলনা। বলেছিলেন, ইচ্ছেটা কেবল বিকাশের একার বলেই বা ভাবছ কেন তুমি? মেয়েও আমাদের বড় হয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই দুজন দুজনকেই দেখছে। আমার তো মনে হয় এ বিয়েতে লীলারও মত আছে। তাছাড়া ওই একটাই তো মেয়ে আমাদের। যা কিছু আছে সব তো ওরই।

কিন্তু মেয়েদের কথায় কান দেবার মত কাঁচা লোক নন বনমালী চৌধুরী। দিন সাতেক পরেই খবর দিলেন, লীলার বিয়ে ঠিক করে এলাম। লীলাকে তারা আগেই দেখেছে। এবার একেবারে আশীর্ব্বাদ করে যাবে।

আর দশদিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল লীলার। বনমালী চৌধুরী হুঁকো হাতে করে বিশ গ্রামের লোকের ভুরিভোজনের তদারক করলেন। আয়োজনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বরের বয়স আর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সব সংশয় ঢাকা পড়ে গেল।

যাবার সময় লীলার বিষন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বনমালী চৌধুরীর হিসেবী মনেও কোথায় যেন খটকা লেগেছিল। মনে হয়েছিল লীলা বুঝি নিঃশব্দে কোন অভিযোগ জানিয়ে গেল। কিন্তু তিনি কী করবেন! জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে এ তিন তো বিধাতাকে নিয়ে। তিনি তো নিমিত্তের ভাগী মাত্র।

ছ'মাস পরে লীলা যখন সিঁদুর মুছে ফিরে এলো, বনমালী চৌধুরী সেদিন তার চোখের দিকে তাকাতে পারেননি। ভয় ছিল লীলা আবার তেমনি করে তাকাবে। সে দৃষ্টি সহ্য করবার শক্তি নেই তার।

এর মাস দুয়েক পরেই বিকাশের মা মারা গেলেন। অদ্ভুত এক মুক্তির আস্বাদ নিয়ে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল বিকাশ। সেও বোধ হয় ছ'বছর হ'য়ে গেল। অনেক কিছু দেখেছে জীবনে, অনেক শিখেছে। বেলেঘাটার কোন অখ্যাত গলির একবার শোনা বাসার নম্বর সে ভুলতেই চেয়েছিল। তবু ছুটির দিনে সেইটাই মনে এলো সবার আগে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর মহিম বোস স্ট্রীটের টিনের চাল দেওয়া এক বাড়ীর সামনে এসে কড়া নাড়ল বিকাশ।

দরজা খুলে দিয়ে ত্রস্ত হাতে ঘোমটা টেনে যিনি সরে দাঁড়ালেন তাকে চিনতে বিকাশের দেরী হলনা।

এ কি, রাঙা খুড়িমা, আমাকে চিনতে পারছেন না, আমি বিকাশ।

ওমা, আমি তো চিনতেই পারিনি। আয় বাবা আয়। তোর কাকা বলছিলেন সেদিন তোর কথা।

ঘরে ঢুকে খাটের উপরে বসল বিকাশ। অন্ধকার ঘর। মেজে পাকা হলেও নীচু বলে স্যাঁৎসেতে।

বিকাশকে বসিয়ে ভিতরের দরজার কাছে গিয়ে ডাক দিলেন রাঙা খুড়িমা, লীলা, ও লীলা ছাখ এসে বিকাশ এসেছে।

ভাতটা নামিয়ে যাচ্ছি।

ভাত নামিয়ে বরং এক কাপ চা করে নিয়ে আয়।

চায়ের কথায় মৃদু আপত্তি তুলল বিকাশ। বলল, না না এখন আবার চা কেন, এইতো চা খেয়ে এলাম।

রাঙা খুড়িমা বললেন, তাতে কী হয়েছে। তোমাদের তো বেশী চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। তা ছাড়া আর তো কিছুই নেই। চৌধুরীদের কী আর সে দিন আছে? কী পাপই যে করেছিলাম বিকাশ, তা না হলে এই বয়সে শ্বশুরের

ভিটে ছেড়ে এই দুর্ভোগ পোয়াতে হয়! কী কুক্ষণেই যে দেশ ভাগ হলো। ওই তো দেখেছ তোমার কাকার স্বাস্থ্য। চিন্তায় চিন্তায় ঘুম নেই। জমান টাকা ভেঙে খেলে আর ক'দিন বল! তবু তো ব্যবসার দিক থেকে একটা সুবিধে করতে পারলেন না। তারপরে এইতো বাসার অবস্থা। বল তো এর মধ্যে মানুষ থাকতে পারে? কিন্তু কোথায় পাব? চেষ্টা ত কম হয়নি।

বিকাশ বলল, তবু এ আপনারা অনেক ভালো আছেন খুড়িমা। এর চেয়ে বেশী কষ্টেও অনেকে আছে। বলরামপুরেব রায়েদের চেনেন তো, তারা আছে সরকারী ক্যাম্পে। সে যা কষ্ট! অথচ দেশে ওদেব অবস্থা তো জানেন। তিনশো বিঘের ওপর খামার জমি।

ততক্ষণে একহাতে চায়ের কাপ আব এক হাতে নাবকেল কোরা দিয়ে মাখা মুড়ি নিয়ে লীলা ঘরে ঢুকেছে।

ওর দিকে তাকিয়ে প্রথমেই বিকাশের মনে হলো সুন্দর। মুখে তার চিরদিনই অসাধাবণ সৌকুমার্য ছিল। কিন্তু সে ছিল কেবলই লালিত্য। এখন তাব ওপর একটু কাঠিন্য মিশ্রিত ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে। হয়তো বা পরিবেশের প্রতিক্রিয়া। তবু তাকে ভালো লাগল বিকাশের। আগের চেয়েও ভালো লাগল। কিন্তু এ লীলা কোনদিন কোন নির্জন সন্ধ্যায় বিকাশের বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছিলো একথা আজ কল্পনাও করা যায়না।

গল্পে গল্পে বেলা হলো। একসময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিকাশ বলল, তাহলে এখন উঠি খুড়িমা। বেলা অনেক হয়ে গেল।

খুড়িমা বললেন, এত বেলায় এখন নাই বা গেলে। বরং এখানেই দুটো ডালভাত খেয়ে নাও। ততক্ষণে হয়তো তোমার কাকাও এসে পড়বেন। দেখাটা হয়ে যাবে।

খুড়িমা ছাড়লেন না। ওখানেই খেতে হলো। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেলেও বনমালী কাকা ফিরলেন না।

বিকাশ বলল, এবার আমাকে যেতে হবে খুড়িমা। লীলা বলল, 'চল, আমিও বেরোব। এক সঙ্গে যাই।

সেকি, তুমি কোথায় যাবে?

কেন, ভয় পেলে নাকি?

খুড়িমা বললেন, ওর আবার ইস্কুল আছে।

ইস্কুল, তুমি কি ইস্কুলে পড়ছ নাকি?

মধুর একটু হাসল লীলা। পাগল হয়েছ, এই বয়সে! ইস্কুল, তবে শেলাইএর। আর পড়তে নয় পড়াতে। দাঁড়াও আমি কাপড় পরে আসি। ভিতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল লীলা।

খুড়িমা বললেন, কী যে গোঁ হয়েছে মেয়ের, আমার কিন্তু একেবারেই ভালো লাগেনা। লীলা চাকরী করছে এও আমাকে দেখতে হলো! কিন্তু মেয়ে কিছুতেই শুনবেনা। বলে তোমাদের দিন আর নেই মা। আজকাল চাকরী করলে মেয়েদের মান যায় না। ভাবি, ওর যদি ভালো লাগে, ও যদি ভালো থাকে এই নিয়ে, তাহলে করুক। সব সাধ আহ্লাদই তো কপাল থেকে গেছে। তবু একটা কিছু নিয়ে আনমনা হয়ে থাক। খুড়িমার চোখ ভিজে উঠল।

একটু পরে কাপড় বদলিয়ে ফিরে এলো লীলা। শাদা খোলের চওড়া কালোপাড় তাঁতের শাড়ী পড়েছে। শাদা ব্লাউজের হাতায় খয়েরি রংএর পরিচ্ছন্ন সূচীকাজ। কেরোসিন কাঠের টেবিলের ওপর থেকে কাঠের হাতল দেওয়া রঙীন কাপড়ের ব্যাগটা তুলে নিল। বলল, চল, আমি তৈরী।

খানিকটা এগিয়ে মোড় ঘুরতেই লীলা বলল, আমি এবার ডাইনে যাব। এইদিকে আমার স্কুল। তুমি এসো কিন্তু মাঝে মাঝে। মা খুব খুসী হবেন। একেবারে একা থাকেন।

আচ্ছা আসব, বিকাশ পা বাড়াল।

আর সারা পথ কেবল একটা কথাই বিকাশের কানে তিক্ত সুরে গুনগুন করল। এসো কিন্তু মাঝে মাঝে, মা খুশী হবেন। মা খুশী হবেন।

বিকাশ ভাবল, এই কঠিন খোলস পেল কোথায় লীলা। সেই লীলা! কোথায় যেন একটা ব্যথার কাঁটা খচখচ করতে লাগল। ভাবল আর যাবেনা বেলেঘাটা। কখনও না।

অথচ পরের সপ্তাহে ছুটির দিন সকাল দশটার মধ্যেই বেলেঘাটার এক এঁদোগলির টিনের চালওয়ালা বাড়ীতে এসে করা নাড়ল বিকাশ। আজও দরজা খুলে দিলেন রাঙা খুড়িমা। লীলা বাসায় নেই। পাড়ার কোন বাড়ীতে মেয়ে দেখতে আসবে, সেখানে ডাক পড়েছে লীলার। দুপুরেও ফিরবার আশা নেই। অগত্যা রাঙা খুড়িমার সঙ্গেই কিছুক্ষণ গল্প করে উঠে দাঁড়াল বিকাশ। বলল, আজ আমি যাই। আবার আর একদিন আসব।

আসিস। সময় পেলেই আসিস। তবু তোদের দেখলে মনটা ভালো লাগে। এখন আর নিজের লোক বলতে তো কেউ নেই।

দিন দশেক পর আবার এলো বিকাশ। লীলা তখন বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। দুয়োরে দেখা হলো। বলল, 'এই যে বিকাশদা। তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। বস, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসব। দরকারী কথা আছে।'

বঁটি পেতে তরকারী কুটছিলেন রাঙা খুড়িমা। মুখ তুলে বললেন, কে বিকাশ, আয় বোস। লীলা এই মাত্র বেরিয়ে গেল। তোর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয় নি ?

হ্যাঁ হয়েছে। বলল, আধ ঘণ্টাব মধ্যেই ফিরবে। কি কথা আছে আমার সঙ্গে।

হুঁঃ, কথা আছে। আচ্ছা বল তো বিকাশ, এটা বাড়াবাড়ি নয় ?

কেন, কী হলো আবার ?

মেয়ে আমার দর্জীর দোকান করবেন। কোথায় একটা পুরনো কল পেয়েছে সস্তায়, কিনে বসেছে। বলে এবার দোকান ঘর চাই, আর একটা লোক। বসে খেতে তার লজ্জা হয়। কী কুক্ষণেই যে ওকে শেলাই শিখিয়েছিল রায় বাড়ীর মেজ বৌ।

তা বেশ তো, এতে লজ্জার কী আছে। অনেক ভদ্রঘরের মেয়েরাই তো এসব করছে আজকাল। বলে রাঙা খুড়িমাব মুখের দিকে তাকাল বিকাশ।

কিন্তু তাই বলে দর্জীব দোকান! না বিকাশ এ আমার ভাল লাগছে না। হলই না হয় দুরবস্থা, তাই বলে মেয়েকে দর্জীর দোকান দিতে হবে।

তার কথা রাঙা খুড়িমার মনঃপূত হচ্ছেনা জেনেও বিকাশ বলল, দুরবস্থার কথা তো নয় খুড়িমা। প্রশ্নটা আত্মসম্মানেব। বসে খেতে যদি ওর সম্মানে বাধে, করুক না কাজ। আর তা ছাড়া—

আর তাছাড়া যা সে আমি ঠিক কবে ফেলেছি। বিকাশের মুখ থেকে এক রকম কেড়ে নিয়েই কথা বললেন রাঙা খুড়িমা। একটা কাজ করবি বাবা বিকাশ ? রাঙা খুড়িমার স্বর কুণ্ঠিত শোনাল। অবশ্য তোকে এ ব্যাপারে কিছু বলবার মুখ আর রাখেনি তোব কাকা। তবুও তুই ছাড়া এখানে আর আপনার জন কেইবা আছে।

একটু ইতস্ততঃ করে বললেন রাঙা খুড়িমা, লীলার আমি আবার বিয়ে দেব ঠিক করেছি। তোর তো অনেক জানাশোনা আছে, দে একটি ছেলে ঠিক করে। আজকাল তো অনেক ছেলেই এরকম বিয়ে করছে শুনি। ওর এই বেশ আর আমি দেখতে পারিনা।

কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ করে উঠল। এক মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বিকাশ বলল, আচ্ছা দেখব। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানেন, যা দিনকাল পড়েছে অল্প মাইনেতে কেউ আর বিয়ের ঝক্কি নিতেই চায় না। আচ্ছা দেখব। কিন্তু লীলা ? তার মত আছে ?

সে আমি যে করেই হোক রাজী করাব।

লীলা ফিরে এলো প্রায় ঘণ্টখানেক পরে। বিকাশ তখন উঠিউঠি করছিল।

তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। সত্যি এমন আটকে গেলাম। মা, বিকাশদাকে চা দিয়েছ ? একটা পিঁড়ি টেনে বসল লীলা।

সে খবর আর তোমাকে এখন নিতে হবেনা। বেচারাকে এতক্ষণ যে জন্যে বসিয়ে রেখেছ সেকথা বলে ছুটি দাও। ও, মা বুঝি তোমাকে সব বলেছে ? আচ্ছা তুমিই বলতো এতে আপত্তির কী আছে ?

না আপত্তির কী থাকতে পারে। আমিও তো সেই কথাই বলছিলাম খুড়িমাকে, তবে ওঁর যখন মন নেই সেক্ষেত্রে—

সে এখন আর বন্ধ রাখা যায়না। মেসিন কেনা হয়ে গেছে। ঘরও প্রায় ঠিক। এখন ভাল একজন লোক হলেই আরম্ভ করতে পারি। এই কাজটি কিন্তু তোমাকে করে দিতে হবে। তোমার তো অনেক জায়গায় জানাশোনা আছে। মোটামুটি দর্জীর কাজ জানে আর বিশ্বাসী হয় এরকম একজন লোক আমাকে ঠিক করে দাও। একাজটি তোমাকে করে দিতেই হবে বিকাশদা।

আচ্ছা দেখি। অন্য একটি লোক যেন বিকাশের গলায় কথা কয়ে উঠল।

আচ্ছা দেখি নয়। লোক আমার চাই। বুঝতে পারছ এখন আর পিছিয়ে আসা যায় না।

হঠাৎ বিকাশ উঠে দাঁড়াল। বলল, বেলা হয়ে গেল, আমি এখন যাই লীলা।

রাস্তা পর্যন্ত বিকাশকে এগিয়ে দিল লীলা। আবার মনে করিয়ে দিল, ভুলোনা কিন্তু। তোমার ভরসাতেই রইলাম।

সারাপথ একটা অস্বস্তিকর অযৌক্তিক ব্যথা বিকাশের মনে মোচড় খেয়ে ফিরল। অথচ কেন যে এই ব্যথা তা জানল না। তারপর একসময় বুঝতে পারল লীলার প্রতি বিতৃষ্ণায় তার সমস্ত মন ভরে আছে—রাত্তিরে ঘুমের সময় পর্যন্ত।

কিন্তু পরদিন প্রশান্ত সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন মনের কোন কোনে আর এতটুকু গ্লানি জমে নেই। রাতের শিশিরে সব ধুয়ে মুছে গেছে। বিকাশের মনে পড়লো লীলা একজন দর্জির কাজ জানা লোক খুঁজে দিতে বলেছে। হঠাৎ মনে এলো দোতলার বিমলবাবুর কথা। মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী ভদ্রলোক। দুতিন মাস হলো এক জ্ঞাতি ভাই এসে কাঁধে ভর করেছে। রংপুর না কোথায় দর্জির দোকানে কাজ করত। দোকান বন্ধ হয়ে যেতে চাকরির খোঁজে কলকাতা এসেছে। পড়েছে এসে বিমলবাবুর ঘাড়ে। একেবারে গোবেচারা ভালোমানুষ। তাই এতদিনেও কোন সুবিধা করে উঠতে পারে.ন।

বিকাশের প্রস্তাব লুফে নিলেন বিমল বাবু। বললেন, বাচালেন মশাই আমাকে। কি বিপদেই যে পড়েছিলাম ওকে নিয়ে। আপনি আজই ব্যবস্থা করে দিন।

পরদিন বিমলবাবুর ভাই রাখালকে নিয়ে লীলাদের বাড়ী গেল বিকাশ। এত তাড়াতাড়ি লোক পাওয়া যাবে আশা করেনি লীলা। রাখালের সঙ্গে আলাপ করে খুশীই হলো। বলল, কিন্তু টাকাপয়সা তো এখন আপনাকে বেশী দিতে পারবনা। নতুন দোকান। আসুন দুজনে খেটেখুটে দাঁড় করাই। তারপরে আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না। যদি রাজী থাকেন তাহলে আসুন কাল থেকেই কাজে লেগে যাই।

তাহলে কাল থেকেই আসতে হবে আমাকে? লীলার দিকে মুখ তুলেই বলল রাখাল।

হ্যাঁ কালই। অবশ্য কাল থেকেই দোকান খুলতে পারবনা। ঘরটা সাজাতে গোছাতে হবে। কিছু কাপড় কেনা দরকার। তারপরে একটা ভাল দিন দেখে কাজ সুরু করা যাবে।

পরদিন থেকেই কাজে লেগে গেল রাখাল।

তিন দিন পরে রাখালের হাতে ছোট্ট একখানা চিঠি পেল বিকাশ। লীলা লিখেছে, সামনের বুধবারে আমি দোকান খুলব। দশটায় আমাদের এখানে এসো। দুপুরে এখানেই খাবে। ইতি—লীলা।

লীলাদের ওখানে পৌছুতে দশটার একটু বেশীই হলো। লীলা বসেছিল তারই জন্যে। বাড়ী থেকে মিনিট দশেকের রাস্তা, গলির মধ্যে মাঝারি সাইজের একখানা ঘর। দুয়োরের দু'পাশে ঘটের ওপর সিঁদুর মাখানো নারকেল। উপরে সাইনবোর্ড ঝুলছে, 'বিনোদিনী টেলারিং হাউস।' বিনোদিনী লীলার ঠাকুমা।

পুরুত ঠাকুর পুজোয় বসেছেন। পুজো শেষ হলে আশীর্বাদ নিল লীলা। প্রসাদী ফুল প্রথমে নিজের মাথায় ছুঁইয়ে একপাশে রেখে দেওয়া সিঙ্গার মেশিনটার গায়ে বুলাল।

মেসিনের ঢাকনি খুলে পা চালিয়ে দিল লীলা। প্রায়-শেষ একটা আদ্দির পাঞ্জাবীর গলাটা স্মুঁচের চারদিকে গোল হয়ে ঘুরে এলো। মাথা নীচু করে দাঁত দিয়ে স্মুতো কেটে নিয়ে মেসিন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লীলা। বিকাশকে বলল, দেখতো গায়ে দিয়ে ফিট করে কিনা। আমার দোকানের প্রথম জামা। তোমাকে দিয়েই বউনি করলাম। দেখা যাক কেমন পয় তোমার।

বিকাশ একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে বলল, কিন্তু মাপ পেলে কোথায়? ও জামা গায়ে লাগবে কি করে!

ওইতো মজা, এতো আর বাজারের সাধারণ দর্জি নয়। আমরা মানুষ দেখেই মাপ আন্দাজ করতে পারি। হিসেবের ভুলচুক হয় না।

তাই নাকি?

এক্ষেত্রে অবশ্য সাহায্য করেছেন রাখাল বাবু। তোমার অজান্তে মাপটা ওঁকে দিয়েই আনিয়েছি। কিন্তু কেমন হয়েছে বল তো?

বেশ হয়েছে। সত্যি তুমি এমন পাঞ্জাবী তৈরী করতে পার তা ভাবতেই পারিনি।

বেশ, এখন যখন পারলে, এবার থেকে জামা এখান থেকেই করাবে। আর তুমি বললে হয়তো তোমার ত্নএকজন বন্ধু বান্ধবও রাজী হতে পারেন। জামা খারাপ হবে না একথা বলতে পারি। আর মজুরীও বাজার থেকে একটু সস্তা পড়বে। বলে দেখো।

রাখাল সম্পর্কে যা ভাবা গিয়েছিল ত্ন'একদিনের মধ্যেই বোঝা গেল সেটা ঠিক নয়। প্রথমে বোকা বোকা মনে হলেও লোকটাকে চিনতে হয়তো একটু ভুল হয়েছিল। না হলে চার পাঁচদিনের মধ্যে মেস থেকে পাচ ছটা জামা আর গোটা তিনেক সেমিজ ব্লাউসের অর্ডার যোগাড় করে ফেলা রাখালের পক্ষে সম্ভব হতো না। শুধু মেসই নয় আশেপাশের ত্ন'চারজন পরিচিত আর অর্ধপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ী থেকেও বেশ কিছু অর্ডার যোগাড় করে ফেলল রাখাল।

নানা কাজে আর মাসখানেকের মধ্যে ওদিকে যাওয়া হয়নি বিকাশের। কিছুতেই সময় করে উঠতে পারেনি। আজ বেলেঘাটার বাসে উঠে তাই কেমন

যেন সঙ্কোচ দেখা দিল মনে। কড়া নাড়ার আগের মুহূর্ত্ত পর্যন্তও কেমন বাধ বাধ ঠেকল।

রাঙা খুড়িমা বললেন, সেই যে গেলি আর তোর দেখা নেই। ভাবলাম অসুখবিসুখ হয়নি তো কিছু। তা রাখাল বলল, না ভালই আছিস। ওর ওতো সময় নেই এক মুহূর্ত্ত। দোকানের কাজে দুজনে খাটছে দিনরাত। যেমনি আমার মেয়ে তেমনি জুটেছে ওই রাখাল। বলে কি জানিস, দেখুন না এই দোকানকে আমরা কী করে তুলি। আপনি কি ভেবেছেন ওই গলির ওইটুকু ঘরেই চিরকাল থাকব আমরা। বড় রাস্তায় বড় ঘর নিলাম বলে। দিনরাত কেবল কাজ কাজ আর কাজ। খেতে যাবারও নাম নেই। শেষে এখানেই খেতে বলে দিলাম। আহা, ছেলেটা বড় ভাল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন রাঙা খুড়িমা।

বিকাশ বলল, লীলাকে দেখছি না। লীলা কোথায়?

তবে আর বলছি কি। দুজনে বেরিয়েছে কাপড় কিনতে।

সেকি, আজতো বিষ্যুৎবার! বিকাশ একটু অবাক হলো।

বড়বাজারে গেছে। সেখানে নাকি দোকান খোলা থাকে।

আরও ঘণ্টাখানেক বসেও কিন্তু লীলার দেখা পেল না। অগত্যা বিকাশ উঠে দাঁড়াল।

এর পরের বিষ্যুৎবার বিকেলে এসেও দেখা পেল না লীলার। একগাদা জামা নিয়ে বেরিয়েছে বাড়ী বাড়ী ডেলিভারি দিতে।

রাঙা খুড়িমা বললেন, আমার আর এসব ভাল লাগে না বিকাশ! কী যে এক দোকান হয়েছে। দিন নেই রাত নেই কেবল ওই। আজকাল আবার ফিরতে প্রায়ই রাত করে। এদিকে বারজনে বার কথা বলে। অথচ মেয়ে আমার কিছুতেই শুনবে না। তুই একটু বলে দেখিসতো বিকাশ যদি তোর কথা শোনে।

লোকের কথায় কী আসে যায়। কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেল বিকাশের মুখ থেকে। লীলাকে তো আপনি চেনেন।

তাতো বুঝি। রাখালকেও ভাল ভাবে চিনি আমি। অমন ছেলে হয় না। কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ করব কী দিয়ে? আমাকেই তো শুনতে হয় সব।

লীলার সঙ্গে দেখা হলো প্রায় দিন পনেরো পরে। তাও রাত্তিরে, দোকানে।

পূজো এসে গেছে। অসম্ভব কাজ বেড়েছে আজকাল। আরও একজন লোক চাই। আর একটা মেশিন না হলেও আর চলছে না।

কথার ফাঁকে বিকাশ বলল, খুড়িমা যখন চান না তখন একটু সকাল সকাল ফিরলেই পার।

লীলা হাসল। মা বুঝি এবার তোমাকে উকিল লাগিয়েছে। কিন্তু এটুকু তো বোঝ যে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। এখন একটু বেশী না খাটলে চলবে কেন?' পূজো সামনে, এব পবে হয়তো আবও রাত হবে। প্রথম দোকান খুলেছি, কোন অর্ডারই ফেরত দিতে পারি না, ওতে নাম খারাপ হয়।

ফেরবার পথে বহুদিন আগে দেখা লজ্জানম্র কোন কিশোরীর একখানা সুকুমার মুখ মনে আঁকতে চেষ্টা করল বিকাশ। আজকের লীলার সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নেই। কোনদিন ছিল একথাও ভাবা যায় না যেন।

আবার কাজে ডুব দিল বিকাশ। যে শিথিল কল্পনা শিকড মেলেছিল মনে তাকে উপড়ে ফেলে দিল। ভুলে থাকতে চাইল লীলার কথা, একেবারে।

ডিউটি থেকে ফিবে সবে জামা কাপড ছেড়েছে, রাখাল এসে হাজিব। বলল, আপনাকে কাল একবার অবশ্য যেতে বলেছেন মাসিমা।

মাসীমা কে? বিকাশ অবাক হলো।

মানে লীলার মা, ওঁকে আমি মাসিমা বলি। কুণ্ঠিতভাবে বলল রাখাল। কাল একবার অবশ্য যেতে বলেছেন আপনাকে। কী দরকাব আছে। রাখাল উঠে দাঁড়াল। বলল, এখন যাই।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরদিন সন্ধ্যার পরে বেলেঘাটা যেতে হলো।

লীলা এসময় বাড়ী থাকে না। বনমালী কাকা গেছেন দেশে। বাসায খুড়িমা একা। লীলা নেই ভাবতে একটু যেন স্বস্তি পেল বিকাশ।

খুড়িমা বললেন, আজকাল তো এমুখো হওয়া ছেড়েই দিয়েছিস।

না, না কী যে বলেন খুড়িমা। কিছুদিন ধবে কাজের চাপ বেড়ে গেছে, তাই—। হঠাৎ এমন কি দরকার হলো বলুন তো?

একটু যেন দ্বিধা করলেন রাঙা খুড়িমা।

লীলার বিয়ে ঠিক করলাম। তুই-ই কিন্তু একমাত্র ভরসা বিকাশ। সব কিন্তু করেকম্মে তোকেই দিতে হবে। তোর কাকা বুড়ো মানুষ, তায় আবার বিদেশ। কাকেই বা চেনেন এখানে? কোন রকমে চার হাত এক করবার ব্যবস্থা তোকেই করে দিতে হবে?

বিস্ময়ের প্রথম ঘোর কাটলে বিকাশ বলল, বিয়ে হচ্ছে কোথায় ?

রাখালের সঙ্গে। বড় ভালো ছেলেটি। মা বাপ নেই। কিন্তু আমরা তো আছি।

কিন্তু লীলা, তার মত আছে ?

হ্যাঁ, তার অমত নেই।

কথার যেন সুর কেটে গেল এর পরে।

ফিরবার পথে রাস্তায় দেখা হলো লীলার সঙ্গে। বলল, দাঁড়াও বিকাশদা, কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বিকাশ নিঃশব্দে পা বাড়াল। তার পাশে লীলার পদক্ষেপ যেন কুণ্ঠিত মনে হলো। কথা ছিল লীলার, অথচ সে চুপ করেই রইল।

তা হলে রাখালকে বিয়ে করছ ?

একটু যেন অপ্রস্তত মনে হলো লীলাকে। কিন্তু মুহূর্তেই সামলে নিল। বলল, হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ চুপ। অনেক ভেবে তাই ঠিক করলাম।

একটু থামল লীলা। মনে মনে যেন কিছু গুছিয়ে নিল।

আমাদের ব্যবসার এটা উঠতি সময়। এখন যদি কিছু রটে তাহলে ক্ষতি হবে। তা ছাড়া মেয়েদের সঙ্গেই কারবার বেশী আমাদের। এসব ব্যাপারে মেয়েরা আবার বড় খুঁতখুঁতে। আর মারও যখন ইচ্ছা—তাই—

এইখানে বিকাশের মুখের দিকে একবার তাকাল লীলা।

রাখাল বাবুকে বিয়ে করাই ঠিক করলাম। এতে ব্যবসার লাভই হবে।

ততক্ষণে তারা বাস স্ট্যাণ্ডে এসে পড়েছে। হেডলাইটের তীব্র আলোয় অন্ধকার কেটে একখানা বাস এসে দাঁড়াল। আর সেই আলোয় বিকাশ লীলার মুখের দিকে তাকাল। শান্ত নিস্তেজ দুটো চোখ। কী যেন হিসেব করছে মনে মনে।

চলতি বাসের পা দানিতে দাঁড়িয়ে বিকাশেব মনে হলো লীলার বাবা বনমালী চৌধুরীর কথা। চৈত্রমাসে চাষারা যখন পেটের দায়ে বীজ ধান বিক্রী করে দিত, তাদের হাতে টাকা গুনে দিয়ে ঠিক এমনি চোখেই তাকাতেন বনমালী চৌধুরী। লাভ লোকসানের হিসেব করতেন হয়তো। সেই ছবিই আজ আবার বহুদিন পরে লীলার চোখে দেখছে বিকাশ। হুবহু এক। আশ্চর্য্য।

নম্বর মিলিয়ে যখন সুশান্তর বাড়ি খুঁজে বের করলাম শীত-সূর্যের শেষ লালটুকু বাদুরডানা অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। এ অঞ্চলটা শহর কলকাতার ক্রমবর্ধমান প্রত্যঙ্গের মত। আঁকশি বাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। দু বছর আগে যেখানে দেখেছি ফাঁকা মাঠ এখন জমজমাট শহরতলী। খেয়ালখুশিতে বেড়ে চলেছে। নিয়ম কানুন নেই, সিজিল মিছিল নেই। রাস্তা খুঁজে পেলেও নম্বর পাওয়া যাবে এমন কথা কেউ দিতে পারে না। পনের নম্বর বাড়ি খুঁজছো হয়তো। এক ঘণ্টা ঘোরাঘুরি কববার পর তের নম্বর দেখে চোখ খুশি হলো কিন্তু তারপরেই সাতচল্লিশ নম্বর ভেংচি কাটছে। তবু এত হার্ডল পেরিয়েও সুশান্তর বাড়ি পেলাম এবং সুশান্তকে বাড়িতে।

আমি যে চিঠি না লিখে হঠাৎ এসে উঠব, মানে বাড়ি চিনে উঠব এতটা আশা করেনি সুশান্ত। আমিই কি করেছিলাম সেই শহরতলীর গোলকধাঁধায় পা দিয়ে!

সুশান্তর বিয়ের পরই আমি কলকাতা ছেড়েছিলাম। সেও প্রায় তিন বছর। সেদিনের ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি এরই মধ্যে হাতে পায়ে বেড়ে গিন্নী হয়েছে। উপলপথের ঝর্ণা সমভূমিতে স্তিমিতস্রোতা প্রবাহিনী। পরিবর্তনটুকু বেশ ভালো লাগল। সবচেয়ে ভালো লাগল ওদের দেড় বছরের মেয়েটিকে। এক মাথা কোঁকড়া চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। শঙ্খ-সাদা গোটা কতক মিহি দাঁতের ফাঁকে মিষ্টিদানা হাসি। আদর করে কোলে নিলাম। বললাম, তোমার নাম কি মা-মণি?

প্রাণপণ চেষ্টায় জিভ এবং তালু দিয়ে কি একটা উচ্চারণ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু কেবল মম্ ছাড়া আর কিছুই বোধগম্য হলোনা। কন্যার উদ্ধারে এবার পিতা এগিয়ে এলো। বলল, মমতা রেখেছি ওর নাম।

আচ্ছা, বলুন তো আজকাল কি কেউ আর অমন নাম রাখে। চায়ের কাপ আর খাবারের ডিস হাতে নিয়ে সুশান্তর স্ত্রী শকুন্তলা ঘরে ঢুকল।

আমি বললাম, তা ঠিকই বলেছেন। শকুন্তলার মেয়ের নাম তো নিশ্চয়ই নয়। অন্ততপক্ষে প্রজ্ঞাপারমিতা-টিতা হওয়া উচিত ছিল—না কি বল মমতা?

না, ঠাট্টা নয়। সত্যি করে বলুন তো, মমতা ছাড়া কি বিশ্বসংসারে আর

কোন নাম ছিল না? প্রথম মেয়ে, লোকে কত বেছে বেছে নাম রাখে, তা না কী এক মমতাই তোমাকে পেয়েছে। যাই বল ইস্কুলে ভর্তি করবার সময় কিন্তু আমি নতুন নাম দেব তা তোমায় বলে রাখছি।

বেশ, তোমার যা খুশি করো। অন্তত বাড়িতে বাবার দেওয়া নামটা মুছে ফেলো না দয়া করে।

সুশান্তর গলায় কিন্তু পরিহাসের কোন সুর খুঁজে পেলাম না। অথচ প্রসঙ্গটা নিতান্তই লঘু। ওঁর স্ত্রীর অজ্ঞাতে সুশান্তর দিকে একবার তাকালাম। কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক মনে হলো। কিন্তু এক মুহূর্ত। হারানো পাঁজ হাতে নিয়ে আবার সুতোয় পাক দিল সুশান্ত। বলল, তুমি তা হলে সর্ত ফিরিয়ে নেবে কুন্তলা?

শকুন্তলা কিছু বলবার আগেই আমি বললাম, কী ব্যাপার? সর্তটা আবার কী?

শকুন্তলা বলল, মুখে তার কৌতুকের হাসি, ওঁর সঙ্গে কথা ছিল ছেলে হলে তার সব কিছু হবে আমার মতে, আর মেয়ে হলে ওঁর।

আমি বললাম, মমতার নাম নিয়ে তো তাহলে আপনার কোন ওজরই আর টেকে না।

না—তা টেঁকে না। আর টিকতে দিচ্ছেই বা কে। শকুন্তলা হাসিতে শিশির ঝরাল।

সুশান্তর বাড়ি ছেড়ে যখন রাস্তায় পা দিলাম পাশের বাড়ির দেয়াল ঘড়িতে আটটার ঘণ্টা পড়ল।

এরই মধ্যে তিন ঘণ্টা কেটে গেল। অন্ধকারে করুণ শোনাল সুশান্তর কথাগুলো। ওঃ কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হলো বলতো। আর তুইও তেমনি—সেই যে আমাদের বিয়ের পর কলকাতা ছাড়লি আর দেখা নেই। না আসিস এক আধখানা চিঠিও দিতে পারিস সময়ে সময়ে। সেই আগের দিনের অভিমানী সুশান্ত। অনেকটা ওর তেমনি আছে। আমার সঙ্গে কত অমিল।

জানিস তো আমার স্বভাব। ওনিয়ে দুঃখ করিস না। চিঠি না লেখা মানেই মনে না রাখা নয়। হাঁটতে হাঁটতে বললাম, আচ্ছা কুন্তলার যখন ভালো লাগেনি তখন না হয় মমতার নামটা বদলেই রাখ। প্রথম সন্তান, ওরও তো একটা ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে।

অনেকক্ষণ সুশান্ত কোন কথা বলল না। আমি বললাম, কীরে তোর হলো কী?

না, কিছুই নয়।

তবে কথা বলছিস না কেন?

কী বলব, নাম বদলাবার কথা? সে হয় না।

ওর ছেলেমানষি জিদ দেখে আমার হাসি পেল। বললাম, কী এমন নামরে যা আর বদলান যায় না।

নাম হয়তো সত্যিই কিছু নয়, কিন্তু—সুশান্ত চুপ করল।

আমি বললাম, কীরে চুপ করলি কেন? গণৎকার রাশি মিলিয়ে রেখেছে বুঝি?

সুশান্ত বলল, না গণৎকার নয়, বলছি। কিন্তু তোর কি আর একটু সময় হবে?

শিরশিরে একটু শীত হাওয়া দিচ্ছিল। সুশান্তর কথায় যেন কৌতূহলের উষ্ণ স্পর্শ পেলাম। বললাম, না এমন কি আর রাত হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে শুনি।

সুশান্তর কাছ থেকে শোনা গল্পটা সিজিল মিছিল করলে এই রকম দাঁড়ায়:

দু বছর পড়বার পরেও যখন ফিএর টাকার অভাবে বি-এ পরীক্ষা বন্ধ হয় হয়, মনে এলো সীতুদার কথা। সুশান্তর বাল্যবন্ধু হিমানীশের মামাত ভাই সীতুদা। সেই সূত্রেই জানা শোনা। ছেলেবেলা থেকেই দেখেছেন সুশান্তকে। স্নেহ করতেন চিরদিনই। কলকাতায় নিজের বাসায় রেখেই পড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুশান্ত রাজী হয়নি। ছেলে পড়িয়ে নিজের পড়ার খরচ চালিয়েছে। নিজের কেউ ছিল না। একটু দূর সম্পর্কের যারা তাদের দ্বারস্থ হয়নি কখনও। কেবল সীতুদাকে নিয়েই পারা যায়নি। কলেজে গিয়ে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে এসেছেন। বাড়িতে গেলে বৌদি। আর সেই জন্যেই, ভালো লাগলেও, ওদিকে যাওয়া বাধ্য হয়েই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন সীতুদার কাছে যেতেই হবে। শেষ বার সীতুদাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ফরিদপুরে হিমানীশদের গ্রামের বাড়িতে। সেও আট ন'মাস আগে। হিমানীশের দাদার বিয়েতে সবাই জড় হয়েছিল। কলকাতায়ও ফিরেছিল এক সঙ্গে। তারপরে আর যায়নি। কেমন যেন ইচ্ছে করেনি। দেশের কোন লোক অথবা কোন আত্মীয়-স্বজন কারও সঙ্গেই প্রায় কোন সম্পর্ক নেই সুশান্তর। নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। তবু সীতুদার কাছে আসতেই হলো। না এসে উপায় ছিল না।

গলির মোড়ে এসে সঙ্কোচে পা ভারী হয়ে উঠল। যাই কি যাব না করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কড়া নাড়ল দ্বিধাগ্রস্ত হাতে। একবার, দুবার, তিনবার। কেউ সারা দিল না। এবার সীতুদার নাম ধরে ডাকল। কিন্তু তবু কোন সাড়া নেই। অথচ দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। শীতের সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় কেউ ঘুমোয়ও না। কী আর হবে। সুশান্ত পিছন ফিরল। কিন্তু পা বাড়াবার আগেই দরজা খুলবার শব্দ হলো পিছনে। সুশান্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা লোক যা হোক, এই সন্ধ্যা বেলায় কি ঘুমুচ্ছিলেন নাকি? ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ওঁর আগে আগে জোর পায়ে যে মেয়েটি কথা না বলে চলে গেল আবছা আলোয় তাকে ও সীতুদার স্ত্রীই মনে করেছিল। কিন্তু মেয়েটির ত্রস্তে হাঁটা আর কথা না বলায় হঠাৎ কেমন খটকা লাগল। তাহলে বাড়ি ভুল করেনি তো! ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা এটা সীতেশ সান্যালের বাড়ি তো?

মেয়ে কণ্ঠের জবাব এলো, হ্যাঁ, তোমার বাড়ি ভুল হয়নি।

কে জানতো এতটা বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল সুশান্তর জন্য। গলার স্বরে চমকে উঠল। বলল, কে অনু না?

কোন জবাব নেই।

অনু, অনুরাধা, তুই কবে এলি? আমি কিছু জানিনে তো। বলতে বলতে বারান্দায় উঠে বসলো। কিন্তু তবু কোন সাড়া এলো না অনুরাধার কাছ থেকে।

কিরে, তুই আবার বোবা হলি কবে থেকে? আয়, এদিকে আয়তো। সীতুদা-বৌদিই বা গেল কোথায়?

ওঁরা সিনেমায় গেছেন। এতক্ষণে চাপা গলায় ভেতর থেকে উত্তর এলো।

বোবা মেয়ের এতক্ষণে কথা ফুটল। তা তুই যে গেলি না বড়? স্বামী-স্ত্রীর অসুবিধে হতো বুঝি?

না, না আমিই যাইনি, শরীরটা ভালো নয় বলে।

সে কিরে, আর তোকে অসুস্থ অবস্থায় একলা ফেলে ওরা সিনেমায় গেল! আসুক আজ, সীতুদা আর বৌদির সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাবে।

তুমি কি পাগল হলে নাকি শান্তদা। ওঁরাতো বলেইছিলেন, আমিই যেতে পারিনি শরীর খারাপ বলে।

বা, এই তো মেয়ের কথা ফুটেছে। তা হ্যাঁরে, তুই আবার এত পর্দানশীন

হলি কবে থেকে, তাও আমার কাছে। আয় এখানে এসে বোস। কতদিন এসেছি দেশ থেকে, আর হয়তো যাবই না কোনদিন। তোর মুখে একটু গল্প শুনি। সীতুদাদের আসতে হয়তো এখনও কিছু দেরী হবে।

কিন্তু অনুরাধার কাছ থেকে কোন সাড়া এলো না। কেমন যেন অস্বস্তি লাগল সুশান্তর। হিমানীশের বোন অনুরাধা। সেই এতটুকু বয়েস থেকে দেখে আসছে। তার সহস্র আব্দারের প্রশ্রয় দিয়েছে চিরকাল। এই তো সেদিনও, আট ন'মাস আগে, কাছে বসে কত গল্প বলেছে, শুনেছে। অথচ সেই অনু হঠাৎ এমন রহস্যময়ী হয়ে উঠল। অনু এখানে এসেছে অথচ সীতুদা তাকে একটা খবর পর্যন্ত দেয়নি, অনুও বায়না ধরেনি শান্তদাব সঙ্গে দেখা কববে বলে। এমন কি এখন তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে চায় না—সবটাই কেমন দুর্বোধ্য মনে হলো সুশান্তর।

আবার ডাকল সুশান্ত, আয় বলছি এদিকে, নাহলে চুলের মুঠি ধরে টেনে আনব। কিন্তু অনু এলো না। রাগ হলো সুশান্তব। অনু, এই অনু, বলতে বলতে ঘরের চোকাঠে পা দিল।

না, না ঘরে এসো না, দোহাই তোমার পাযে পড়ি শান্তদা। অনু কান্নায় ভেঙে পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে সুশান্ত। দরজার এক কোণ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে অনু। ওর দিকে তাকিয়ে সুশান্ত থমকে গেল। অনুর কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা। সর্বাঙ্গে আসন্ন মাতৃত্বেব সমাবোহ।

অনুর বিয়ে হলো অথচ কেউ তাকে খবরটাও দেয়নি। আর তা নিয়ে এত বাড়াবাড়িইবা করছে কেন অনু।

সুশান্ত বলল, বাঃ আচ্ছা মেয়ে যা হোক। বিয়ে হলো, একটা খবর পর্যন্ত দিলিনে। বাড়ি বয়ে দেখা করতে এলাম তাও কেঁদে কেটে সারা। থাক না হয় চলেই যাচ্ছি।

সুশান্ত পা বাড়াতেই কান্নাভরা গলায় ডাকল অনুরাধা—শান্তদা।

যেন কাকুতির মত শোনাল।

সুশান্ত ফিরে দাঁড়াল। কী, কী হয়েছে তোর অনু?

অনেক কষ্টে কান্না থামাল অনু। ভিজে গলায় বলল, কেন, তুমি কিছু জান না? কেউ কিছু বলেনি তোমাকে?

না, কে কী বলবে? দেশের কারও সঙ্গে তো আমার দেখা হয় না বহুদিন। খবরও রাখি না কারও।

ও!

কিন্তু তাতে কী হয়েছে? কী শুনবার কথা বলছিলি তুই, তোর বিয়ে? শুনলে আর অবাক হব কেন তোকে দেখে।

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল অনুরাধা। মুখের কমনীয় রেখা মুছে গিয়ে অনমনীয় দৃঢ়তা ফুটে উঠল। হাতের উল্টো পিঠে চোখের জল মুছে ফেলে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল সুশান্তর দিকে। বলল, বিয়ে! কে বলল আমার বিয়ে হয়েছে?

ইলেকট্রিকের খোলা তারে হাত লাগল সুশান্তর। কথা বলতে গিয়ে মনে হলো জিভ খুঁজে পাচ্ছে না। তাহলে কি অনুরাধার মাথা—। সবটাই কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অনুরাধার দিকে তাকিয়ে রইল বোকার মত। অনেক কষ্টে কেবল বলতে পারল, অনু।

কি, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা, পাগল ভাবছ আমাকে?

সুশান্ত চুপ। অনুরাধার মুখের অস্বাভাবিক পেশীগুলোয় আবার শিথিল কমনীয়তা ফিরে আসছে। শুকনো চোখের জমি আবার চিকচিক করে উঠল।

মিথ্যা, সব মিথ্যা শান্তদা। ওরা সবাই মিলে আমাকে শাস্তি দিচ্ছে। আমার ভুলের শাস্তি। তুমি এখানে কেন এলে, কেন এলে শান্তদা! ফুলে ওঠা কান্নার ঢেউ নিয়ে খাটের ওপর আছড়ে পড়ল অনুরাধা। এক রাশ ফেনায় ভাঙল যেন।

সুশান্ত দাঁড়িয়ে রইল দরজা ধরে। কেউ যেন তার হাতে পায়ে পেরেক পুঁতে দিয়েছে।

অনুরাধার ব্যবহারে সমস্ত অসঙ্গতির কুয়াশা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো।

প্রথম গোটা কয়েক সেকেণ্ড। তার মধ্যেই নিজেকে সামলে নিল সুশান্ত।

অনুরাধার মাথার কাছে বসে এক রাশ কালো চুলে বিলি কাটতে লাগল।

আস্তে আস্তে বলল, চুপ কর অনু। কাঁদিস না লক্ষ্মীটি।

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে এক সময় চুপ করল অনুরাধা।

সুশান্ত বলল, যেন কানে কানে, এ ভুল তুই কেন করলি অনু, কেন করলি?

অনুরাধা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। পরিষ্কার গলায় বলল, ভুল কি কেউ ভেবে-চিন্তে করে, শান্তদা?

তবে বিয়ে, তোরা বিয়ে করলি না কেন?

সে হয় না, সে অসম্ভব শান্তদা। অনু দুহাতে মুখ ঢাকল। ও কথা বলো না।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল।

অনু বলল, তুমি আর দেশে যেয়ো না শান্তদা।

কেন রে?

সেকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। বলতে পারবো না।

সুশান্ত ডাকল, অনুরাধা।

অনু ভয়ে ভয়ে তাকাল। ছেলেবেলা থেকেই রেগে গেলে সুশান্ত ওকে অনুরাধা বলে ডাকে। এই ডাককে ওর বড় ভয়।

অনুরাধা মুখ নীচু করে ধীরে ধীরে বলল, ওরা তোমার নামে—

থাক, বুঝেছি।

—আমাকে বিশ্বাস করো শান্তদা, আমি একথার প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু ওরা আমাকে ভয় দেখিয়েছে, আমার বাবা আর কাকা। ওরা আমাকে মেরেই ফেলত যদি বৌদি আর সীতুদা না থাকত। বৌদি জানে সব কথা। ওকে বলেছি। দোহাই তোমার আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না!

সুশান্তর সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী নিষ্ক্রিয়। কে জানত এরকম কোন দৃশ্যের মুখোমুখি তাকে হতে হবে। তার সামনে যে মেয়েটি অসহায়ের মত ফুলে ফুলে কাঁদছে, তাকে কোনদিন দেখেনি সুশান্ত। কোনদিন চেনেনি। আসন্ন মাতৃত্বের সবটুকু নমনীয়তা ওর দেহে, কিন্তু কী অসহায়। অবাঞ্ছিত হলেও যে আসছে বহিরবয়বে আয়োজনের এতটুকু ত্রুটিও সে সইতে নারাজ।

সুশান্ত চুপ করে বসে রইল। সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ডাকল, অনু।

অনুরাধা তাকাল। সিক্তপক্ষ্ম দুটি চোখে অবসন্ন দৃষ্টি। এই পাঁচ মিনিটে পাঁচ যুগ পাড়ি দিয়েছে সুশান্ত। উথাল-পাথাল চিন্তার সমুদ্র সাঁতরে ডাঙায় পা দিয়েছে।

অনু, সুশান্ত একটু থামল। তুমি আমাকে বিয়ে করবে? সম্বোধনের অনায়াস এবং আকস্মিক পরিবর্তন নিজের কানেও কেমন বেখাপ্পা লাগল। চমকে উঠল অনুরাধা। এমনভাবে তাকাল সুশান্তর দিকে যেন ওর কথা কিছুই বুঝতে পারেনি।

ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন? আমার কথা কি তুমি বুঝতে পারছ না? অনুরাধার হাত ধরে ঝাঁকানি দিল সুশান্ত।

না, বুঝতে আর পারছি কোথায়? অনুরাধা এত স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে জানত না সুশান্ত।

আমি তোমায় বিয়ে করব, বুঝতে পারছ?

অনুরাধা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসল। উদগ্র আগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে আছে সুশান্ত। অনুরাধা, বল তোমার আপত্তি নেই। যে মিথ্যা ওরা রটিয়েছে তাই সত্যি হোক। বল তোমার অমত নেই।

প্রস্তরমূর্তির ঠোঁট নড়ল। না, তা হয় না। প্রত্যেকটি শব্দ নিরুদ্বেগ শান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করল অনুরাধা।

কেন, কেন হবে না অনু? বিস্মিত বেদনায় আর্দ্র হলো সুশান্তর গলা। তুমি তো আর ছেলেমানুষটি নেই। তোমার নিজের কথা ভাব—তোমার সন্তানের কথা।

ভাবি বলেই তো তা হতে পারে না। তোমাকে আর এব মধ্যে জড়াতে পারব না। ও-কথা আর দ্বিতীয়বার তুমি বলো না। তাহলে এত চেষ্টাতেও যা করতে পারিনি, এবার বোধ হয় তাই করতে হবে।

মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান। অথচ কী আশ্চর্য পরিবর্তন হলো অনুরাধার। আর এর সবটাই সুশান্তর চোখের সামনে।

অনুরাধা থামতেই সুশান্ত বলল, কী, কী করতে হবে?

আত্মহত্যা। কথাটা এমনভাবে বলল অনুরাধা যেন বাইরে বেরুবার আগে কাপড় পাল্টাবে। আর তাই ওর শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল সুশান্ত। সমস্ত গ্লানির নির্মোক পরিত্যাগ করে যে মেয়েটি তারই সামনে উঠে দাঁড়াল, তার ব্যক্তিত্ব সমীহ করবার মত।

তোমার কথা আমি কখনও ভুলব না শান্তদা। কিন্তু তুমি যাও। এখানে আর এসো না। আমার ভুলের শাস্তি আমাকে একাই নিতে দাও। আমার ছেলে শুধু আমারই হোক।

কখন যে বড় রাস্তায় এসে বাসে চেপেছিল সুশান্তব মনেই নেই। কণ্ডাক্টর টিকেট না চাইলে মনে হতোও না।

সীতুদার বাড়ী আর যায়নি সুশান্ত। খোঁজ নেয়নি আর কারও। দু'বছর অজ্ঞাতবাস করেছে। বি-এ পরীক্ষাও আর দেওয়া হয়নি। লটারীর টিকেটে টাকা পাবার মত একটা চাকরী জুটে গেল হঠাৎ, আর সেই সঙ্গে শকুন্তলা। বিয়ের সাক্ষী ছিলাম আমি আর অন্য একটি বন্ধু। ওর আত্মীয়স্বজন যারা তাদের

এড়িয়ে চলত। নিজের আর কেই বা ছিল। অনুরাধার কথা মনে হতো মাঝে মাঝে। একটি অভূতপূর্ব নাটকীয় সন্ধ্যা। নিস্তরঙ্গ জীবনে ঘটনার হঠাৎ ঝড়। এই পর্যন্ত।

বিয়ের বছর দুই পরে আবার দেখা হলো অনুরাধার সঙ্গে। এবারও আকস্মিক। শকুন্তলাকে ভর্তি করতে হলো কলকাতার এক বিখ্যাত প্রসূতি-ভবনে। এই প্রথম সন্তান। দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তার ওপর এই সময়েই অফিসের জরুরী কাজে দিন তিনেকের জন্য বাইরে যেতেই হলো। আদালতের সমন। পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে দেখাশোনা করতে বলে বাইরে গেল সুশান্ত।

কলকাতা ফিরে সোজা এলো হাসপাতালে। তখন সবে চারটে। ভিজিটরদের ভীড় তখনও শুরু হয়নি। এনকয়েরী থেকে খবর পেল মেয়ে হয়েছে। ভালো আছে শকুন্তলা। যাক নিশ্চিন্ত। ওয়ার্ডে গিয়ে বেড খুঁজে নিতে দেরী হলো না। শকুন্তলা শুয়ে আছে, পাশে ছোট খাটে ঘুমুচ্ছে একটি মাংসপিণ্ড। শকুন্তলাও চোখ বুজে ছিল, সুশান্তকে দেখতে পায়নি। টুল টানবার শব্দে চোখ মেলল। কী স্নিগ্ধ ওর দুটি চোখ। শকুন্তলার চোখ যে এত সুন্দর আজ এই প্রথম জানল সুশান্ত। ওর ক্লান্ত একখানা হাত নিজের দুহাতে টেনে নিয়ে বলল, কেমন আছ, খুব কি কষ্ট হয়েছিল?

স্নিগ্ধ হাসির যুঁই ছড়াল শকুন্তলা। না, তেমন কোন কষ্ট হয়নি। তুমি ভালো ছিলে তো? কখন এলে?

এই মাত্র, স্টেশন্ থেকেই সোজা এখানে আসছি।

দেখ তো কাণ্ড। দুপুরে হয়তো চান-খাওয়া কিছুই হয়নি। একটু পরে এলে কী ক্ষতিটা হচ্ছিল শুনি?

সুশান্ত ওর হাতে আর একটু চাপ দিল। বলল, এটা হাসপাতাল, তোমার বাড়ী নয়। তোমার হুকুম এখানে অচল। তোমাকেই হুকুম মেনে চলতে হবে। এখানে তোমার কোন কষ্ট হয়নি তো?

না, একেবারেই না। এত যত্ন আমার বাড়ীতেও হয় না। আচ্ছা, একটু থামল শকুন্তলা, অনুরাধা তোমার কী রকম বোন হয়? কোনদিন বলনি তো ওর কথা।

সুশান্ত চমকে উঠল। অনুরাধা—তাকে তুমি চিনলে কি করে। কোথায় সে? এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু লজ্জিত হলো সুশান্ত।

বাঃ সে না হলে আর দেখা-শুনা কে করত হাসপাতালে। আমি যে

হাসপাতালে আছি সে কথা মনেই হয় না। ও না থাকলে যে কী করতাম জানি না।

অনুরাধা কি এখানে নার্স?

বাঃ, এ খবরটুকুও রাখ না। বেচারা এত দুঃখ করছিল। রেজিস্টারে তোমার নাম দেখেই ওর সন্দেহ হয়েছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি মীরপুরের সুশান্ত চক্রবর্তীর স্ত্রী কি না? আমি তো অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? ওকে চিনলেন কী করে? বলল, চিনেছি যে এই যথেষ্ট, বাকীটা পরে শুনবেন। আমি অনু, অনুরাধা; সুশান্তদার সম্পর্কে বোন হই। যাক তবু এতদিনে খোঁজ পাওয়া গেল। আমি তো ধরে নিয়েছিলাম বুঝি বা হিমালয়েই চলে গেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখুন, বিয়ে করল একটা খবর পর্যন্ত দিল না। যাক এবার পেয়েছি হাতের মুঠোয়, সুদে আসলে উসুল করে ছাড়ব। সেই থেকে বেচারা আর কাছ-ছাড়া হয়নি।

আশ্চর্য, সেই অনুরাধা। সেই সন্ধ্যার অসহায় মেয়েটি। সে ছবি তো ধূলোয় চাপা পড়েছিল। একটি মেয়ে ধীর-পায়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তবু তার দুই চোখে ছিল বাঁচবার আগ্রহ। সে তাহলে মরেনি। বেঁচে থাকবার আস্বাদ পেয়েছে তাহলে অনুরাধা। কিন্তু সে কোথায়—সেই অনাহূত আগন্তুক। সুশান্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। শকুন্তলা বলল, কই বললে না তো?

—কি? যেন শকুন্তলার কোন কথাই সে শুনতে পায়নি।

—বা, অনুরাধা তোমার কেমন বোন।

—ও, আমার ছেলেবেলার বন্ধুর বোন। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। আমার নিজের বোনের মতই। উঃ কতদিন দেখিনি ওদের। কোথায় আছে জান?

এখানেই হোস্টেলে থাকে। আসবে এক্ষুনি। আমার জন্যে কাল সারা রাত জেগেছে। আজও সকালে ডিউটি ছিল। একটায় গিয়েছে বাসায়। হয়তো খেয়ে একটু ঘুমুচ্ছে।

অনুরাধা যখন এলো ওয়ার্নিং বেল বেজে গেছে। চোখ দুটো ফোলা-ফোলা। একটু লাল।

শকুন্তলার শিয়রে সুশান্তকে দেখে আঙুল দিয়ে চোখ কচলাল। ভালো করে তাকিয়ে দেখল একবার। কাছে এলো। বলল, শান্তদা না, কখন এলে?

অনেকক্ষণ। তোমার কথাই বলছিল এতক্ষণ কুন্তলা। এসো।

খুব লোক যা হোক। একটা খোঁজ-খবরও রাখতে নেই? বিয়ে করলে তাও জানালে না। তবু ভাগ্যিস বৌদিকে চিনে বের করেছিলাম। এবার আর রেহাই নেই। দুটো খাওয়া একসঙ্গে। কী সুন্দর মেয়ে হয়েছে, দেখেছ?

সে কৃতিত্ব তোমার বৌদির।

কুন্তলা লাল হলো।

ওদিকে তখন শেষ ঘণ্টা পড়েছে। একে একে ওয়ার্ড খালি করে ভিজিটররা চলে যাচ্ছে। সুশান্ত উঠল।

অনুরাধা বলল, চল তোমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

সুশান্ত অবাক হচ্ছিল অনুরাধাকে দেখে। জীবনের প্রথমভাগের সব-কখানা কালি-মাখান পাতা ছিঁড়ে ফেলেছে যেন। সুশান্ত বলল, এখানে কতদিন আছ অনু?

তিন বছর। তার মধ্যে এক বছর ট্রেনিংএ।

হিমানীশ কোথায়?

নৈহাটি।

তোমার মা-বাবা সবাই?

সবাই এখন দাদার কাছে। বাড়ী থেকে চলে এসেছে।

সীতুদা, বৌদি ভাল আছে?

হ্যাঁ। তোমার কথা এত বলেন? একবার দেখাও তো করতে পার। বৌদি প্রায়ই আসেন আমার এখানে। ওঁর জন্যেই এখানে ঢুকতে পেরেছিলাম আমি। না হলে যে কি হতো। অনুরাধা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

উপায় নেই। হাওয়ায় বুঝি ঝরান পাতা উড়ল। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় গেটের কাছে এসে পড়েছে। বাইরে এরই মধ্যে সন্ধ্যা নেমেছে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি করি করেও করতে পারছিল না সুশান্ত। অবশেষে বলেই ফেলল—তোমার ছেলে কোথায় অনু?

চলতে চলতে হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অনুরাধা। অনেক কষ্টে নিঃশ্বাস চাপল যেন। বলল, ছেলে নয়, মেয়ে। নাম রেখেছিলাম মমতা। কিন্তু ওরা মমতাকে একবার দেখতেও দেয়নি আমাকে, জানো শান্তদা। বাবা জোর করে নিয়ে গেছেন। কাকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

অনুরাধার কথাগুলো জড়িয়ে গেল। ওর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল সুশান্ত। বলল, কোন খবরও পাও নি?

পেয়েছিলাম, বেঁচে নেই।

সুশান্তর হাতের মধ্যে থর-থর করে কাঁপছে অনুরাধার হাত। আপ্রাণ চেষ্টা করছে কান্না চাপতে। তবু ভালো, রাস্তা অন্ধকার। লোক চলাচলও কম।

কিন্তু সহজেই নিজেকে সামলে নিল অনুরাধা। আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। বলল, বৃথাই তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম শান্তদা। ভেবেছিলাম একাই পারব আমার সন্তানকে বাঁচাতে। পারলাম না। তোমাকেও ওরা রেহাই দেয়নি। হাসপাতালের রেজিস্টারে মমতার বাবা বলে তোমার নামই লিখিয়েছে, পরে জেনেছি আমি। আমার আবার বিয়ে দেবার চেষ্টাও করেছিলেন বাবা। কিন্তু আর ভুল করিনি। বৌদির চেষ্টায় এখানে ট্রেইনী নার্স হয়ে গেলাম। বাবা আর কোন খোঁজ-খবর রাখেন নি। মা চিঠি লেখেন মাঝে মাঝে অভাব-অভিযোগ জানিয়ে। যখন যা পারি পাঠিয়ে দিই।

অনুরাধাকে বড় বেশী প্রগলভা মনে হলো। হয়তো জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাই ওকে প্রগলভা করেছে।

আরও একটু হেঁটে অনুরাধা ডাকল, শান্তদা।

এযেন পাঁচ বছর আগের অনুরাধা। ছুটির শেষে কলকাতা আসবার সময় এই অনুরাধাই ফরমাস করত, আবদার জানাত।

কি অনু, কিছু বলবে?

আমার একটা অনুরোধ রাখবে শান্তদা?

বল।

যদিও এরকম অনুরোধ করা অন্যায়, তবু তুমি বলেই করছি। অনুরাধা যেন সাহস সঞ্চয় করছিল।

আঃ অনু, বক্তৃতা থামিয়ে তোমার কথাটা বল।

তবু একটু দ্বিধা করল অনুরাধা। ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে বলল, সম্ভব হলে তোমার মেয়ের নাম মমতা রেখ। তোমার মেয়ের মধ্যে তবু তার নামটা বেঁচে থাক। কেউ তো তাকে চায়নি।

ততক্ষণে ওরা বড় রাস্তার মোড়ে এসে পড়েছে। রাস্তার আলোয় অনুরাধার মুখের দিকে তাকাল সুশান্ত। ওর চোখে জল নেই, বিষণ্ণ করুণ কাকুতি।

তাই হবে, তোমার কথাই থাকবে অনু, সুশান্ত প্রতিশ্রুতির মত উচ্চারণ করল কথাগুলো।

অনুরাধা বুঝি কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সুশান্তর বাস এসে পড়ল।

সুশান্ত যখন গল্প শেষ করল আমরা ট্রাম-ডিপোয় পৌঁছে গেছি। আমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে বলল, জানি মমতা নাম কেউ আর রাখে না। তবু পাল্টাবার সাধ্য নেই আমার। ওই নামে একটি মেয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার পায়নি একথা ভুলতে পারব না।

চলতি ট্রামে বসে ভেবেছিলাম আমিই কি পারব ?

স্কাইলাইটের কাঁচে দুপুরের শাদা রোদ আস্তে আস্তে নিস্তেজ হলুদ হয়ে আসবে। আশেপাশের বেড়াগুলোতে একটা নিঃশব্দ উন্মুখ চঞ্চলতা উঁকিঝুঁকি দেবে। জোড়াজোড়া ক্লান্ত করুণ চোখ ঘুরে ফিরে ওয়ার্ডে ঢুকবার দরজায় গিয়ে স্থির হবে। আর একটু পরেই সিঁড়ির বাঁকে দুএকজন করে মানুষের মাথা ভেসে উঠবে, দুএকটা শাড়ির পাড়। ভিজিটিং আওয়ার্স সুরু হতেই সিঁড়ির বাকে যে মাথাটি দেখা দেবে সে গিয়ে বসবে ষাট নম্বর বেডের পাশে একটা টুল নিয়ে। হাতের ঠোঙাটা ল্যাকারের ওপর নামিয়ে রেখে প্রথম কথা বলবে, আজ কেমন আছ? এরপরে একটি বিমর্ষ বিধবা মেয়ে। ধীর পায়ে পথ হেঁটে একেবারে কোণের বেডে বসে পড়বে। প্রৌঢ় রোগীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেবে। প্রৌঢ়ই কথা বলবেন আগে, সব খবর ভালতো?

এরপরে একে একে লোক আসবে, মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো। কারও হাতে বই। কারও হাতে ফলের ঠোঙা। যার যার এসে টুল টেনে নিয়ে বসে পড়বে রোগীদের পাশে। কেউ কেউবা খাটের ওপর। কেউ কেউ সারাদিন অফিসে কাজ করে ফেরবার পথে হাসপাতালে এসেছে। কর্তব্য। আর কেউবা অলস দীর্ঘ দুপুরের দিবানিদ্রার পরে বিকেলে একটা কাজ পেয়ে হাঁফ ছেড়েছে। এদের চোখেমুখে এখনও ঘুমের প্রশান্তি।

এদের সবার কথাই যে শুনতে পায় সুব্রত এমন নয়। অনেকের কথাই শোনা যায় না। তবুও দিনের পর দিন ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে অঙ্গভঙ্গির ভাষাটা আয়ত্ত হয়ে গিয়েছে। কানে কিছু না শুনলেও বুঝতে পারে সব কথা।

বেলা যখন আরও গড়িয়ে যাবে স্কাইলাইটের হলুদ হয়ে আসা মৃদু রোদে লালের ছোপ পড়বে তখন সিঁড়ির বাঁকে দেখা দেবে আরও একটি মাথা। কোনদিন বা এলানো চুল, কোনদিন বা বিনুনি। আরও একটু উপরে উঠে এলে হাতে ফলের ঠোঙা অথবা কোন পুষ্টিকর বিলিতী পানীয়ের কৌটো দেখা যাবে। পরনের শাড়িটি আটপৌরে। তবে পরবার ধরণে আছে রুচির মার্জনা। কৃশ শ্যামল লম্বাটে মুখে নবাঙ্কুর স্নিগ্ধতা। মেয়েটি এসে বসবে উনচল্লিশ নম্বর বেডের পাশে। যে বেডে আজ দুমাস পড়ে আছে সুব্রত।

প্রথমে কথা বলেনা। ঈষৎ চঞ্চল চোখ একবার ওর সারা গায়ে বুলিয়ে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে প্রত্যয়-দৃঢ় গলায় বলে, আজ তোমাকে অনেকটা ভালো দেখাচ্ছে।

সুব্রত কোন কথা বলেনা। মৃদু হেসে ওর হাতখানা কেবল মুঠ করে ধরে। এই কথা—একই কথা আজ নিয়ে যে কতবার শুনল, সে হিসেব সুব্রতর মনে নেই। তারপর ল্যাকারের উপর রাখা ফলের ঠোঙা অথবা হরলিক্‌স-এর শিশির দিকে তাকিয়ে বলে, আবার এনেছ ওগুলো? কেন মিছি মিছি এতগুলো পয়সা নষ্ট করতে গেলে। এখানে যা দেয় তাতেইতো হয়ে যায় আমার। এ তোমার অন্যায় সুমিতা।

কিন্তু ওতেতো প্রয়োজন মেটে না।

প্রয়োজনতো অনেক কিছুতেই মেটেনা। কিন্তু সব প্রয়োজন মেটাবার মত সামর্থ্য তোমার কোথায়? এতেইতো নিজের ওপর অবিচার সুরু করেছ। সুমিতার প্রসাধনহীন ঈষৎ-রুক্ষ মুখেব ওপর চোখ রাখল সুব্রত।

ধীরে ধীরে অন্যদিকে মুখ ফেরাল সুমিতা।

কী, কথা বলছনা যে? সুব্রতর গলা অধীর হয়ে উঠল।

আপাতত একটা ট্যুইশান নিয়েছি। কিন্তু সেকথা তোমাকে ভাবতে হবে না।

বাড়ীতে জানে?

না, তার প্রয়োজনও নেই। এতেও যদি না কুলোয় অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সে তেমন বড় কথা নয়। এখন সবচেয়ে বড় কথা তোমার সেরে ওঠাটা। সুব্রতর বুকের ব্যাণ্ডেজের ওপর একবার সস্নেহে হাত বুলাল সুমিতা।

আজও কি ট্যাপ করেছে?

হ্যাঁ, আজও। হয়তো সারাজীবনই এইরকম চলবে। সুস্থ হয়তো আর আমি কোন কালেই হবনা।

সুব্রতর মুখে হাত চাপা দিল সুমিতা। কী সব যাতা বলছ। প্লুরিসি যেন আর কারও হয়নি। ওকি আবার একটা রোগ নাকি।

বাইরে আবছায়া অন্ধকার নেমেছে, ওয়ার্নিং বেল বাজল। ধীরে ধীরে সমস্ত ওয়ার্ডটাই খালি হয়ে এলো। সুমিতাও উঠে দাঁড়াল এক-সময়।

এ ওয়ার্ডে নতুন এসেছে সুব্রত। অনেক ওয়ার্ড ঘুরেফিরে। কেবিনেও ছিল কিছুদিন। প্রথম মাস তিনেক। তখন টাকা জোগাতেন দাদা। কর্ত্তব্য করেছেন সাধ্যমত। কিন্তু তিনমাসেও যখন কিছু হলো না তখন বাধ্য হয়েই ওয়ার্ডে আসতে হলো। দাদার পাঠান টাকার অঙ্ক ক্ষীণ হতে হতে এখন 'তম' প্রত্যয়ে এসে ঠেকেছে। তবু ভাগ্যে সুমিতা ছিল। তাইতো এখনও নিয়মিত খাবারে কমতি পড়ছেনা, ক্যাপষ্ট্যান ছেড়ে নামতে হচ্ছে না ডিলাক্স অথবা বার্কলিতে। খেতে হয় অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে। সিষ্টাব রিণা হেনজি দেখলে চটে যায়। অনুযোগ করে, মুখ থেকে কেড়ে নেয। তার রাগদীপ্ত চোখের কোণে বুঝিবা একটু অনুরাগের রেখাও ধবা পড়ে। অন্তত সুব্রতর তাই মনে হযেছে। হয়তো এ তাব অসুস্থ মনের বিলাস। তবু কথাটা তার মনে হয়েছে। সন্দেহটা দৃঢ়মূল হযেছিল অন্য কাবণে।

সুব্রত তখন এই ওয়ার্ডে কেবল এসেছে। প্রথম দিনসাতেক সুমিতা আসতে পাবেনি। বাইবে যেতে হয়েছিল কোন এক মাসতুতো বোনের বিয়েতে। প্রথম দিন থেকেই তাব ওপব প্রসন্ন রিণা মাইকেল। কেন, কে জানে, অকারণে তত্বতালাস কবেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করেছে ভিজিটব আসেনি বলে। খোঁজখবব নিয়েছে আত্মীয়স্বজনের। তারপব সুমিতা যেদিন প্রথম এলো, সুব্রতব চোখ এডায়নি, পাশ দিযে যেতে-আসতে বারবার সুমিতার দিকে আডচোখে তাকিয়েছে রিণা হেনজি।

রাত্তিবে টেম্পাবেচাব চার্ট লিখতে এসে একবার ঢোঁক গিলে দুবার ঠোঁট চেটে অবশেযে কথাটা বলেই ফেলেছিল বিণা। আচ্ছা মিঃ সেন, সেদিনতো বললেন কলকাতায আপনার কেউ নেই। এ মেয়েটি তবে কে ?

আপনার কী মনে হয় ? বিনা দ্বিধায় প্রশ্ন করেছিল সুব্রত।

আমার—আমার ?

হ্যা, আপনার।

কিছু মনে করবেন না ?

না।

আবার ঢোঁক গিলল রিণা। ঠোঁট ভেজাল আর একবার। হঠাৎ বলে বসল তারপবে, ফিয়াসেঁ।

কে জানে।

আর কথা বলেনি। কথা বাড়ায়নি সুব্রত।

সুমিতার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সম্বন্ধে সে হয়তো এখন আর তেমন সচেতন নয়। ভেবে দেখছেনা ভালো করে। সুমিতাকে ও মেনে নিয়েছে। যেমন করে মেনে নিয়েছে তার রোগ আর হাসপাতালকে। হয়তো ঠিক তাও নয়। হয়তো আরও একটু বেশী। নাহলে স্কাইলাইটের রঙ পাল্টানর সঙ্গে সঙ্গে মন এমন চঞ্চল হয় কেন? ভালো লাগে কেন সুমিতা এসে বসলে। গায়ে মাথায় হাত বুলোলে। একদিনতো সে সত্যিই ভালোবাসত সুমিতাকে। তবে আজকাল এমন হচ্ছে কেন? একটু বুঝি নির্লিপ্ত। হয়তো তার এই দীর্ঘ দিনের অসুস্থতা। এই পরিবেশ। নিজেকে বুঝিয়েছে সুব্রত। এই যে একটি মেয়ে নিজের অস্বচ্ছলতাকে উপেক্ষা কবে ট্যুইশানের টাকা থেকে তার জন্যে এটা-ওটা কিনে আনছে, এর জন্যে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারত সুব্রত। কিন্তু পারছে না। তাব কেমন অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। তাহলে, সুব্রত ভাবল, তাহলে হয়তো সে এখনও ভালোবাসে সুমিতাকে। হ্যাঁ, এখনও। কিন্তু সুমিতা? সে যেন কেমন সুদূর হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন এক অচেনা লোক সুমিতার চোখে তাকায় তার দিকে। কেমন যেন অস্বস্তিকর চাউনি। যেন কিছু লুকোচ্ছে।

পর পর দুদিন এলোনা সুমিতা। এ-রকম আরও দুএকবাব হয়েছে গত একমাসের মধ্যে। সুব্রতর মনে হলো তার অসুখ বেড়ে গেছে। তার বুঝি কেউ নেই। ক্লান্ত চোখ জোড়া বৃথাই দরজার ওপব মাথা খুঁড়ে মরল।

রাত্রে টেম্পারেচার নিতে এসে জিজ্ঞাসা করল রিণা, কি মিঃ সেন, আপনাব ভিজিটরতো এলোনা আজও।

কে জানে, হয়তো কোন কাজে আটকে পড়েছে। তাছাড়া রোজই যে আসতে হবে এমনতো কোন কথা নেই।

টেম্পারেচার দেখে কিন্তু মুখ গম্ভীর হলো রিণা মাইকেলের।

মিঃ সেন, আজ এসময় আবাব টেম্পারেচার বাইজ করল কেন?

তা আমি কি করে বলব। হয়তো অসুখটা আবার বাড়বে।

আপনি একেবারেই ছেলেমানুষ মিঃ সেন। দুদিন ভিজিটর আসেনি তাইতেই এত চঞ্চল হয়ে পড়েছেন?

আমি···কই না, কে বললে? সুব্রত দুর্বল স্বরে প্রতিবাদ করল।

বলছে আপনার টেম্পারেচার, আপনার পাল্‌স্‌। আপনার চোখমুখ সব।

আমরা রোগী নিয়েই কারবার করি মিঃ সেন। কাৎ হয়ে শুয়ে মাথার চাদরটা টেনে দিল সুব্রত।

রাত দুপুরে হঠাৎ ঘুম ভাঙল সুব্রতর। অনুভব করল কার যেন মৃদু গোটাকতক আঙুল তার চুলের মধ্যে খেলা করে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য স্নিগ্ধ সেই স্পর্শে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সুব্রতর। সাড়া দিল না। চোখের পাতা দুটো একবার খুলেই আবার বন্ধ করে দিল।

কিন্তু ওতেই টের পেয়েছিল রিণা। হাত সরিয়ে না নিয়েই আস্তে আস্তে ডাকল, মিঃ সেন।

এবার চোখ খুলে তার দিকে তাকাল সুব্রত।

এখন কেমন লাগছে? ঘুমে কোন ডিসটার্ব্যান্স হয়নি তো?

না।

আবার চোখ বুজল সুব্রত।

মিঃ সেন।

কি?

একটা গান শুনবেন?

গান? সুব্রত রিণার মুখের ওপর তাব চোখ রাখল। আপনি শোনাবেন?

হ্যাঁ, তাছাড়া আর কে। অনেকটা ইজি ফিল করবেন। চলুন ওদিকের কেবিনে।

সুব্রতর হাত ধরে ধীরে ধীবে তাকে বিছানা থেকে উঠতে সাহায্য করল রিণা। নিয়ে এলো ওয়ার্ডের এক কোণে একটি খালি কেবিনে। একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল সুব্রতকে। টেবিলের ওধারে আর একটা চেয়ারে নিজে বসল।

সুব্রতর তাকাল রিণার মুখের দিকে। আশ্চর্য সুন্দর দুটি চোখ। স্নিগ্ধ। স্নেহকমনীয়। দিনের আলোয় একে কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তারপর একসময় রিণা গুনগুন করে উঠল—আমার মল্লিকা বনে যখন প্রথম ধরেছে কলি…।

গান শেষ হবার পরেও তন্ময় হয়ে বসেছিল সুব্রত। রিণা ডাকল, চলুন মিঃ সেন, এবার আপনাকে শুইয়ে দিই।

পরের দিনও এলোনা সুমিতা। এবং তার পরের দিনও। অথচ ফল এলো

দারোয়ানের হাত দিয়ে। এক টিন গোল্ড ফ্লেক। এক বাবু দিয়ে গেছেন। বলেছিল দারোয়ান। সিগারেট কিছুতেই ছাড়তে পারেনি সুব্রত। যদি নাই ছাড়তে পারে তাহলে যেন ভালো সিগারেট খায়, বলেছিল সুমিতা। আর পরের দিন নিজেই নিয়ে এসেছিল গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট।

আজকেও তার আশা ছেড়ে দিয়েছিল সুব্রত। কিন্তু সুমিতা এলো তখন ছটা বাজতে মিনিট দশেক বাকী। আর সুব্রতর দিকে না তাকিয়েই কৈফিয়তের মত বলল, কী করব, মার হার্টের অসুখটা হঠাৎ বেড়ে উঠল, তাই। কিন্তু তুমি অযথা দুশ্চিন্তা করোনি তো! কোনরকম চিন্তা করা তোমার শরীরের পক্ষে খারাপ। সারাক্ষণ একটিও কথা বললনা সুব্রত। দারুণ অস্বস্তিতে আরও কিছুক্ষণ ছটফট করে ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই সুমিতা উঠে দাঁড়াল।

আজ তাহলে যাই! দু'একদিন আসতে না পারলে অযথা চিন্তা করোনা। ল্যাকারের দিকে তাকিয়ে বলল, একি হরলিক্‌স্ ফুরিয়ে গেছে। আচ্ছা, কাল পরশুই একটা নিয়ে আসব।

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে ল্যাকারের ওপর রাখা বইটা দেখিয়ে বলল, ওখানা রইল। তোমার প্রিয় লেখকের লেখা। নতুন বেরিয়েছে।

সুমিতা চলে গেলেও ঠিক তেমনি চুপ করে শুয়ে রইল সুব্রত। শীতের জ্যোৎস্নায় কুয়াশার মধ্যে দূরের মানুষের মুখের মত মনে হলো সুমিতাকে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছেনা। কেবল আদল দেখে পরিচিত বলে মনে হচ্ছে।

ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আলো জ্বলল। বাইরে পাতলা অন্ধকার কার্নিসের গা ঘেঁষে ঘন হয়ে উঠল। দিনের ডিউটি শেষ করে এ্যংলো ইণ্ডিয়ান নার্স বুড়ি মিসেস স্থামসন বিদায় নিল, গুড্ নাইট্ মাই চাইল্ড। উইস ইউ এ গুড্ স্লিপ এ্যাণ্ড এ প্লেজ্যাণ্ট ড্রিম।

পাশের ল্যাকারের ওপর থেকে সুমিতার রেখে-যাওয়া বইখানা একসময় অলস হাতে তুলে নিল সুব্রত। এলোমেলো পাতা উল্টিয়ে গেল একবার। আর ভেতর থেকে কি একটা টুপ করে পড়ল তার বুকের ওপর। একখানা ফটো। ছেলেটাকে চেনে সুব্রত। দেখেছে কয়েকবার সুমিতাদের ওখানে। ফটোটাকে কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর বালিশের নীচে রেখে দিয়ে বই বন্ধ করল।

এক সপ্তাহ পরে আবার রাত্তিরে ডিউটি পড়েছে রিণার। টেম্পারেচার নিতে

এসে সুব্রতকে অসময়ে ঘুমুতে দেখে একটু অবাক হলো। মৃদু গলায় ডাকল, সুব্রতবাবু, মিঃ সেন।

সুব্রত ঘুমোয়নি। চোখ বুঁজে পড়েছিল শুধু। বলল, কি?

এমন অসময়ে ঘুমুচ্ছেন যে? শরীরটা ভাল লাগছেনা বুঝি?

কই, শরীর তো ভালই আছে। সে কথাতো আমার চেয়ে আপনিই বেশী বোঝেন।

তাহলে মন। মন ভালো নেই। কিন্তু আপনার ভিজিটরতো আজ এসেছিলেন।

আমি একটু চুপ করে থাকতে চাই মিস্ মাইকেল।

ও! চার্ট শেষ করে চলে গেল রিণা। একটা কথাও বললনা।

আর রিণা চলে গেলে সুব্রতর মনে হলো সে বুঝি অন্যায় করে ফেলেছে। কোন দরকার ছিল না বেচারাকে কষ্ট দেবার। সুব্রতর মনে হচ্ছে তাকে ভালবাসতে সুরু করেছে রিণা। পাশাপাশি মনে এল সুমিতার মুখ। কিন্তু সে যেন অনেক দূরে। যে ব্যথা সারা সন্ধ্যা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল এখন তার পালা বদল হলো। ব্যথা তাকে রেহাই দিল না। তবে সে ব্যথা সুমিতা দূরে চলে গেল বলে নয়—রিণাকে অযথা দুঃখ দিয়েছে বলে। কিন্তু তবু সুমিতাকে মনে পড়ে।

আবার পরপর তিনদিন এলোনা সুমিতা। সুব্রতর জন্যে এক ডজন ডিম এলো। কিছু আঙুর আপেল আর মাখনের একটা কৌটা। যথারীতি সেই দারোয়ানের হাত দিয়ে। আজও সুব্রত ভেবেছিল সুমিতা আসবে না। হয়তো আর কোনদিনই আসবেনা সে। কিন্তু ঘড়িতে পাঁচটা বাজতেই সিঁড়িতে সেই পরিচিত মুখ নজরে পড়ল।

আজ আর কোন কৈফিয়ৎ দিলনা সুমিতা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কেবল বলল, কেমন আছ আজ?

ভাল। সংক্ষিপ্ত উত্তর সুব্রতর।

এরপরেও কথা হলো। কথা বলল প্রায় সুমিতাই। ফলগুলো ঠিক ঠিক খাচ্ছ তো? একি মাখনের কৌটা এখনও খোলনি কেন? এত সিগারেট খাচ্চ কেন ইত্যাদি।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হলে যখন উঠে দাঁড়াল, বইখানা ওর হাতে তুলে দিল সুব্রত। বলল, পড়া হয়ে গেছে।

সুমিতা পা বাড়িয়েছিল, সুব্রত বলল, আঃ এই ছাখ ভুল হয়ে গিয়েছিল। এই ফটোটা ছিল তোমার বইএর মধ্যে। বালিশের নীচ থেকে ফটোখানা বের করল সুব্রত।

সুমিতার মুখে কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিল। চোখ এড়ালনা সুব্রতর।

ফটোখানা হাতে নিয়ে একবার সুব্রতর দিকে তাকাল সুমিতা। স্যাণ্ডেলটা খুঁজে নিয়ে পা বাড়াল তারপরে।

সেইদিন রাত্তিরে মাথা-মুখে কার মৃদু স্পর্শে আবার ঘুম ভাঙল সুব্রতর। সুব্রত বুঝতে পেরেছিল, তবুও বলল, কে ?

আমি, রিণা।

সুব্রত কথা বলল না। ওর সেবাপরায়ণ হাতখানা একবার শুধু নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরল। অস্ফুটে একবাব ডাকল, রিণা।

কি ? কি বলছ !

না, কিছু না।

সুমিতা যে আর আসবেনা একথা সুব্রত আগেই জানত। বোধহয় অনেকদিন আগে থেকেই। তাই যখন পরপর পাঁচ সাতদিন সুমিতা এলোনা সুব্রতর মনে কোন প্রশ্ন ওঠেনি।

সুমিতা এলোনা, কিন্তু তার চিঠি এলো দিন দশেক পরে। লিখেছে, সুব্রত তুমি যা অনুমান করেছ তাই ঠিক। আজ তিন দিন হলো আমার বিয়ে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যার ফটো দেখেছিলে আর যাকে আগেও দেখেছ আমাদের বাড়ীতে সেই অভিলাষের সঙ্গেই। ভুল হয়তো আমারই হয়েছিল প্রথমে। ওর কাছ থেকে টাকা ধার করবার অধিকারই ছিলনা আমার। কিন্তু তোমার প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে সে কথা তখন মনে হয়নি। মনে যখন হলো তখন দেরী হয়ে গেছে। আমার অজান্তেই ওকে ভুল বুঝবার অবকাশ দিয়েছি। তবুও ও জানত তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা। জানত তোমার প্রয়োজনের কথা। যদি ভেবে থাক অভিলাষ সে সুযোগ নিয়েছে তাহলে ওর ওপর অবিচার করা হবে। আমিই বরং সুযোগ করে দিলাম। ওর কাছে কৃতজ্ঞতার বোঝা টানতে পারব না বলে। তার চেয়েও বড় কথা তোমার প্রয়োজন। নিজের উপর অযত্ন করোনা। যখন যা তোমার দরকার ঠিক সময়েই পাবে। —সুমিতা।

চিঠি পড়ে আশ্চর্য হলোনা স্থব্রত। এ যেন তার জানা ছিল। এ যেন হবেই। যেন এছাড়া আর কিছুই হতে পারতনা।

বিকেলে যখন টেম্পারেচার নিতে এলো রিণা, স্থব্রত বলল, আজ রাত্তিরে একটা গান শোনাবে রিণা?

রিণা একটু অবাক হলো। স্থব্রত কখনও অনুরোধ করেনি এর আগে।

কিন্তু আজ রাত্রেতো আমার অফ্।

ওঃ থাক তাহলে।

একটু ভাবল রিণা। বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। স্থশীলার সঙ্গে ডিউটি বদলে নেব।

সেদিন রাত্তিরে মৃদু গলায় একের পর এক গান গাইল রিণা। আর তার সামনের চেয়ারে মুগ্ধ দুটি চোখ নিয়ে চুপ করে বসে রইল স্থব্রত।

একসময় গান থামিয়ে রিণাই বলল, আর নয় এবার শুতে যাবে চল। স্থব্রতর রোগশীর্ণ হাত দুখানা নিজের হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রিণা। আর সেই মুহূর্তে রিণাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিল স্থব্রত। রিণা বাধা দিল না স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল কেবল স্থব্রতর দিকে। যেন মা তার বুকের ওপর দুরন্ত ছেলের খেলা দেখছে।

পরদিন স্থব্রতর টেম্পারেচার একটু উপরে উঠল। চিন্তায় কুঁচকাল রিণা মাইকেলের ভ্রূ। কিন্তু সে কেবল একদিনই। তার পরদিন আর জ্বর এলোনা। তার পরের দিনও না। পরপর সাতদিন ভালো গেল। ওয়ার্ড ফিজিসিয়ান ডাঃ চৌধুরী বললেন, এবার তাহলে আপনি সেরেই গেলেন মিঃ সেন। আর বেশী দিন হয়তো আপনাকে ধরে রাখতে হবে না। রিণা মাইকেলকে বললেন, মিঃ সেন আমাকে ভাবিয়েই তুলেছিলেন মিস্ মাইকেল। কিন্তু এ-কদিনে আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে। হি স্থড্ রিমেন গ্রেটফুল টু ইওর ওয়াণ্ডারফুল নার্সিং।

আরও দিনকুড়ি পরে জানালেন ডাঃ চৌধুরী, এবার আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ মিঃ সেন পরশু দিনই আপনাকে ছেড়ে দেব ঠিক করেছি।

কিন্তু এত বড় সুখবরেও স্থব্রতকে খুশী মনে হলোনা। দীর্ঘ দিন পরে অসুস্থ অন্ধকার থেকে আবার সে আলো-বাতাসের রাজ্যে ছাড়পত্র পাচ্ছে। আবার জীবন। আবার বাঁচবার আনন্দ। কিন্তু তবু এ-খবর শুনে তেমন খুশী হতে পারছে কই। বাইরের আলো-হাওয়ার রাজ্য থাক স্থমিতাদের জন্য। সে এখানেই ভালো আছে।

বিকেলে খবরটা দিল রিণাকে। মাথার শুভ্র অবগুণ্ঠন একবার বাঁ হাত দিয়ে ঠিক করে নিয়ে বলল রিণা, জানি। ইচ্ছে ছিল সুখবরটা নিজেই দেব। তা ডাঃ চৌধুরী সে আশায় ছাই দিয়েছেন।

সুখবর! সুব্রতর কণ্ঠে অভিমান।

বা, সুখবর ছাড়া তবে আর কী! এতদিন পরে ছাড়া পাচ্ছ হাসপাতাল থেকে, এটা সুখবর হলোনা?

কিন্তু হাসপাতাল থেকে বাইরে যাবার মানে কি জান?

মানে সুস্থ জীবনে ফিরে যাওয়া। এতো সহজ কথা। রিণার কথাগুলো ফোয়ারা থেকে জল ঝরে পড়বার মত। একটুকু জড়তা নেই। দ্বিধা নেই।

সোজা কথা! পুনরুক্তি করল সুব্রত, এর মানে কি এই নয় যে তোমার থেকে আমাকে দূরে চলে যেতে হবে?

সে তো একদিন না একদিন হবেই। রোগী কোনদিন পাকাপাকিভাবে হাসপাতালে থাকতে আসে না। আর থাকতে দেওয়াটাও হাসপাতালের নিয়ম নয়।

তোমাকেও তাহলে আমার সঙ্গে যেতে হবে। সুব্রত রিণার একখানা হাত চেপে ধরল।

এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল রিণা। স্থির দুটো চোখ রাখল সুব্রতর চোখের ওপর। বলল, তা হয় না।

হয়না—সুব্রত এবার ভেঙে পড়ল। যদি জানতেই যে হয় না তাহলে এতদিন এসবের কী দরকার ছিল! কী দরকার ছিল! কান্নার দুর্দমনীয় বেগ সামলাতে গিয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল সুব্রতর সমস্ত শরীর, পাণ্ডুর দুটি ঠোঁট।

শহরে মস্‌লিন অন্ধকার নেমেছে। সেই অন্ধকারে রিণার চোখের দিকে তাকাল সুব্রত। একটা নতুন আবিষ্কার হঠাৎ তাকে চাবুক মারল। রিণার চোখে সুমিতার শেষের দিকের দৃষ্টি। তেমনি বিব্রত।

রিণা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। সুব্রতর মনে হলো লাগসই কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না বলেই। তারপরে সত্যিই কথা বলল রিণা, কী যে দরকার ছিল তা আমি এই মুহূর্তে আপনাকে বোঝাতে পারব না মিঃ সেন। তবে আপনার প্রয়োজনটাকে তো অস্বীকার করতে পারবেন না। না হয় মনে করুন যা কিছু করেছি সবই আপনার প্রয়োজনে। আপনার বাঁচবার, সুস্থ হয়ে উঠবার প্রয়োজনে।

এরপরেও একটু হাসল রিণা। মায়ের অসুখের কৈফিয়ৎ দিয়ে যে-রকম হেসেছিল একদিন সুমিতা।

আপনি এখানে একটু একা বসুন। ভালো লাগবে। আমাকে এখুনি একবার ওয়ার্ডে যেতে হবে।

রিণার ধবধবে সাদা এ্যাপ্রন দুয়োরের আড়ালে হারিয়ে গেল। আর সুব্রতর মনে হলো সুমিতার চিঠির কয়েকটা কথা। সবচেয়ে বড় কথা তোমার প্রয়োজন।

প্রয়োজন। কথাটা অন্ধকারে একবার উচ্চারণ করল সুব্রত। কিন্তু আমার না তোমাদের। রোগ-পাণ্ডুর ম্লান ঠোঁট দুখানি একটু বাঁকল শুধু।

বাসা দেখে খুশি হলো অণিমা।

ট্রাম থেকে নেমে দু'পা হাঁটলেই বাঁহাতি দোতলা বাড়ী। দোতলায় থাকেন বাড়ীওয়ালা নিজে। স্বামী আর স্ত্রী। একতলাটা ভাড়া। অবনীশ-অণিমার সংসারেও চাকর ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি অনুপস্থিত।

সামনেটা ফাঁকা মাঠ। হু হু হাওয়া। পশ্চিমের জানালা খুললেই চোখে পড়ে সযত্নে গোছান একটি শোবার ঘর। পর্দার আড়ালে কৌতূহলী মেয়েলী দৃষ্টিও আবিষ্কার করেছে অণিমা। আশা আছে দুদিনেই আলাপ হবে। এইতো সবে এলো। এখনও সব সিজিল মিছিল করাই হলো না। তবু ওপরের বৌটির একবার নিজের থেকে এসে আলাপ করে যাওয়া উচিত ছিল। শত হলেও অণিমা তো এখানে নতুন।

সে এলো দিন তিনেক পরে। দুপুরে রান্নাঘরের পাট সেরে অণিমা তখন হাল্কা একটা গল্পের বইএর পাতা ওল্টাচ্ছিল। চমৎকার ঘুম আনে এই বইগুলো। দরজার বাইরে কথা শোনা গেল, 'কী করছেন ভাই?'

অণিমা উঠে বসল। বইটা মুড়ে রেখে গায়ের কাপড় ঠিক করল। ততক্ষণে সে ঘরে ঢুকে পড়েছে।

বছর বাইশ তেইশ বয়েস। ছোট কপালে একটিপ ডগডগে সিঁদুর। যৌবনের শেষ ঢেউটি এখনও ফেনায় ভাঙেনি। সুগোল শ্যামলা হাতে শাদা শাঁখার অনুশাসন।

বৌটি অণিমার বিছানায় বসল।

'আমরা দোতলায় থাকি', বৌটি কথার শেষে হাসল একটু। 'আরও আগেই আসা উচিত ছিল। আপনি নতুন এসেছেন এখানে। আমাদেরই উচিত সুবিধে অসুবিধের খোঁজখবর নেওয়া। কিন্তু একা মানুষ; কিছুতেই পেরে উঠি না। আজ উনি মফঃস্বলে বেরিয়ে যেতে তবেই আসতে পেরেছি। এখন পাঁচ সাত দিন নিশ্চিন্ত মনে গল্প করা যাবে।'

ওর কথায় আত্মীয়তার সুরটুকু স্পর্শ করল অণিমাকে। তিন দিনের মধ্যে একবারও খোঁজ না করার জন্যে যেটুকু মেঘ জমেছিল মনে এতক্ষণে তা জল হয়েছে।

'জানেন ভাই আগে যিনি ছিলেন তাকে দেখলেই ভয় করত আমার। বুড়ো বুড়ো মেয়েগুলোকে পর্যন্ত ধরে ধরে মারতেন। আর দিনরাত ঝগড়াঝাটি তো লেগেই ছিল। একটু যদি শান্তিতে থাকবার যো ছিল।'

'কিন্তু ঝগড়াঝাটি তো আমরাও করতে পারি।' কথার শেষে হাসি ছড়াল অণিমা।

'হুঁ, তা আর নয়। এ তিন দিনে যে নমুনা দেখেছি। আসতে না পারলে কি হয়, খোঁজ খবর সবই রাখি। আপনাকে তো চোখের আড়াল করতেই তাঁর প্রাণান্ত।'

'তাহলে গোয়েন্দাগিরি করেছেন বলুন।'

ওটা মেয়েদের অপবাদ নয়। পাশের টিপয়ের দিকে চোখ পড়তেই বলল, 'একি ঢাকনি করেন নি কেন টিপয়ের। আচ্ছা আমার কাছে বাড়তি আছে দিয়ে যাব একটা। ঢাকনি না দিলে এমন সুন্দর বার্ণিশটা দেখবেন দুদিনেই নষ্ট হয়ে গেছে। আলনাটা ওদিকে নয়, দেয়াল ঘেঁষে এদিকে রাখুন। ভারি চোরের উপদ্রব ভাই এদিকে। ওই যে ওপাশের ওই হলদে বাড়ীটা—রাত্তির বেলা জানালা দিয়ে আঁকসি গলিয়ে এক আলনা জামা-কাপড় নিয়ে গেল।'

কথা বলতে বলতে নিজে নিজেই আলনাটা টানাটানি সুরু করল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অণিমাও হাত দিল। বলল, 'একি আপনি আবার কেন হাত দিলেন। ওসব পরে হতো। এই তো এলেন, একটু বসুন গল্পসল্প করি।'

কিন্তু ততক্ষণে আলনা জানালার কাছ থেকে সরে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। টানাটানিতে যে কাপড়গুলো একটু আধটু আগোছাল হয়েছিল সেগুলি ক্ষিপ্র হাতে ঠিক করে দিয়ে খাটে বসল বৌটি।

'আপনার নামটি কি ভাই। আমার নাম অণিমা। অনু বলেই ডাকে সবাই।'

'আপনার স্বামীর জন্যে ওটুকু আর জানতে বাকী নেই। আমার নাম মালতী।'

'কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনার?'

'তিন বছর। আপনাদের?'

'এই ফাল্গুনে দুই হবে।' অণিমা বলল, 'কোলে বাচ্চা দেখছি নে।'

মালতীর মুখে ছায়া পড়ল। 'না কেউ আসেনি এখনও।'

'কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল মালতী।'

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল অণিমা। গল্পে গল্পে কখন ঘড়ির কাঁটা পৌনে পাঁচ ছুঁই ছুঁই করছে।

'আপনি একটু বসুন। চাকরটাকে ডেকে উনুনে আঁচ দিতে বলি। চা না খেয়ে যাবেন না যেন।'

'না, আজ নয়। পরে। আমারও অনেক কাজ পড়ে আছে।'

অণিমার মনে যে ভয় ছিল মালতী ঘুচিয়ে দিল। শুনেছে আর দেখেওছে, ভাড়াটে বাড়ীর অসুবিধে। জলকল নিয়ে ঝগড়া। জলকল আলাদা হলেও ঝগড়া করবার ছুতোর অভাব নেই। এ বাড়ীতে এসেও প্রথম প্রথম সেই ভয় ছিল। কিন্তু মালতীর মত প্রতিবেশী কল্পনাও করেনি অণিমা।

পরের দিন দুপুরে পাল্‌টি দিল অণিমা। চুপি চুপি দোতলায় চলে গেল। কোণের বড় ঘরের পর্দা সরাল। মালতী মেঝেয় বসে স্ুঁচ-সুতো নিয়ে কী সেলাই করছে। পায়ের শব্দে চোখ ফেরাল। অণিমাকে দেখে হাতের সেলাইটা একপাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

'এই যে এসো ভাই, ভাবছিলাম তোমার ওখানেই যাব।' বলেই লজ্জায় জিভ কাটল মালতী। 'এই দেখুন তুমি বলে ফেললাম।'

'তাতে কী হয়েছে? আমারও ভাই বেশীক্ষণ আপনি-আজ্ঞে ভালো লাগে না। তুমিই বেশ।' অণিমা বসল।

'সেই ভালো।. কিন্তু তোমার এখন বেশী ওপর নীচ না করাই ভালো এই সময়টা। কতদিন?'

'সাত মাস।' অণিমা বলল মৃদু গলায়। তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ল, 'কী সেলাই করছিলে?'

'না, না ও কিছু নয়।' সেলাইটাকে আরও দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল মালতী।

'দেখিই না।' নীচু হয়ে সেলাইটা তুলে নিল অণিমা।

ছোট একখানা কাঁথা। সুতোর পাড় হচ্ছে। অণিমার ঠোঁটে হাসি ফুটল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মালতীর দিকে। দেহমধ্যভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো।

মালতী অধোবদন।

'কতদিন?'

'না, না কোথায় কি তার ঠিক নেই, তুমিও যেমন।'

'ঠিক নেই—তবে একী হচ্ছে ?' কাঁথাটাকে দেখাল অণিমা।

'সত্যি ভাই এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। হয়তো এই দু' মাস। হয়তো নয়। কিছুই নয়। কেউ আসবে না, আসতে পারবে না।'

মালতীর কথা শুনে চমকে উঠল অণিমা। স্বরে প্রত্যাশা নেই, অনন্ত নিরাশা।

স্নেহে কোমল হলো অণিমার স্বর। 'কেন, একথা বলছ কেন ? 'আগে কি কিছু হযেছিল—না এই প্রথম ?'

'না, প্রথম নয়।' মালতী ভেঙে পড়ল।

পাশে বসে মালতীর হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল অণিমা। বলল, 'ওরকম কত হয়। তাতে কি হয়েছে। তোমার আর কি দোষ বল। এবার সাবধানে থেকো। প্রথম থেকেই ভালো ডাক্তার দেখিও। তোমার স্বামীকে বলেছ ?'

'হ্যাঁ!' মালতী চমকে উঠল। 'না, না ও জানে না, ওকে বলো না।'

'না, কেন ? একি লজ্জা পাবার জিনিষ ? তা ছাড়া তোমার যখন স্বাভাবিক নয় ওঁকে এখনই জানান উচিত।'

মালতীকে কেমন অসহায় দেখাল। বলল, 'না—এখনই নয়। পরে বলব দরকার হলে।'

'হ্যাঁ, বলো। চেপে রাখা ঠিক নয়। ঘরে তো তোমার অন্য কেউ নেই। আমারও সেই দশা। সামনের মাসেই দাদার কাছে চলে যাব ঠিক করেছি। ওঁর কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় কি ? কী কপাল দেখ, বাসা নিলাম তোমার বাড়ীতে তা তুমিও সেই আমারই মত একা।'

হঠাৎ নীচের থেকে ডাক এলো—'অনু, অনু, অণিমা।'

ওরা দুজনেই চমকে উঠল। অণিমার মুখে হাসি ফুটল। 'এইরে আবার অফিস পালিয়েছে। কী যে হয়েছে। একটুও যদি স্বস্তিতে থাকতে দেয় লোকটা। বলে ভয় করে। বলতো এইতো সবে সাত মাস, এখনই ভয় পাবার কি আছে ? তা ছাড়া চাকর আছে বাড়ীতে। আমিও কচি খুকিটি নই। আর এই নিয়ে অফিসে বন্ধুরা হাসি ঠাট্টা করে। একটু লজ্জাও যদি থাকে লোকটার।'

সিঁড়িতে এসে কথা বলল অণিমা। 'কী হয়েছে, অত চেঁচাচ্ছ কেন ? আবার অফিস পালিয়েছো তো ?'

'আগে নীচে এসোই না। দেখ কাকে ধরে এনেছি। আজ একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।'

'দাঁড়াও যাচ্ছি।' অণিমা জামা-কাপড় ঠিক করতে করতে নীচে নেমে গেল। কৌতূহলী হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল মালতী।

'ইনি শ্রীভবতোষ রায়। আমরা একসঙ্গে পড়তাম। ইঞ্জিনীয়ার এ্যাণ্ড পামিষ্ট। এঁর পরিচয় আর তোর কাছে নাইবা দিলাম ভবতোষ।' অণিমাকে বলল, 'আমাদের বিয়ের পর এই প্রথম কলকাতায় এলো। অফিসে এসেছিল দেখা করতে। বাড়ীতে ধরে নিয়ে এলাম। কেন জান? কেবল আলাপ করিয়ে দিতেই নয়। আরও উদ্দেশ্য আছে। ভবতোষ শুধু ইঞ্জিনীয়ারই নয়, গণৎকারও বটে। তোমার করপদ্মখানি একবার মাত্র ওর সামনে সম্প্রসারিত কর। ব্যস, আর দেখতে হবে না। তুমি গণেশ জননী হবে না—ওকি ওকি পালাচ্ছ কেন?'

কিন্তু অণিমা ততক্ষণে পালিয়েছে।

ভবতোষ বলল, 'আঃ দিলি ভদ্র মহিলাকে তাড়িয়ে। না তোর আর বুদ্ধিশুদ্ধি কোনকালেই হবে না।'

'ও অনু, শোন শোন। এগুলো আগে নাও। এইগুলো জলপাইএর আচার আর এটা আম। নেবুগুলো রেখে দাও। রোজ খাবে তিন বেলা খাবার পরে। আর আজ বিকেলে তৈরী হয়ে থেক, অফিস থেকে ফিরে টিরে ছটায় যেতে হবে ডাক্তার সরকারের কাছে।'

কিন্তু কোথায় অণিমা। ওরা দুজনে গিয়ে ঘরে বসল। নীচে ষ্টোভের শব্দ শুনল মালতী। অণিমা চা করছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ওরা দুজন দুবন্ধু বেরিয়ে যেতেই ওপরে এলো অণিমা।

'দেখলে তো ভাই কাণ্ডখানা। লজ্জার একশেষ। এমন লোককে নিয়ে কী যে করি।'

মালতী উপরে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছিল। দেখেওছিল কিছুটা। হাসল। কিন্তু বড় ম্লান।

'তা এক কাজ করো না ভাই, তুমিও চল আমাদের সাথে। একবার দেখিয়ে আসবে ডাক্তার সরকারকে। খুব ভালো ডাক্তার। প্রথম থেকেই দেখান ভালো।'

কিন্তু মালতী শুনে যেন ভয় পেল। বলল, 'না, না তার দরকার নেই।

তা ছাড়া এই সবে মাস দুই। উনি বাইরে থেকে ফিরে এলেই যা হয় করা যাবে।'

মালতীর স্বামী ফিরে এলো দিন তিনেক পরে। কাঠের ব্যবসা ভদ্রলোকের। কলকাতার আশেপাশে বাগান ইজারা নিয়ে কাঠ আনে। তাই তদারক করতে প্রায়ই যেতে হয় বাইরে।

স্বামী ফিরে আসবার পরেও ডাক্তার দেখাতে যাবাব কোন আয়োজন দেখা গেল না মালতীর তরফ থেকে। অণিমার মনে হলো স্বামীকে লুকোতে চাইছে মালতী।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো সে দিন রাত্তিরে। অবনীশের নিমন্ত্রণ ছিল শ্যামবাজারে। ফিরতে রাত হবে বলে গেছে। খাওয়া দাওয়া সেরে একখানা বাংলা উপন্যাস নিয়ে বসেছিল অণিমা। ওপব থেকে চড়া গলায় কথা শোনা গেল।

'এটা খেয়ে ফেল বলছি।' ভারী মোটা গলা। মালতীর স্বামী।

'না, খাব না, কিছুতেই খাবনা। আগেব বারও তুমি তাই বলেছিলে। ভালো হবে ভেবেই আমি খেয়েছিলাম। কিন্তু এ কি হল! এবার আমি খাব না, কিছুতেই খাব না।'

'আ, বলছি ভালো ডাক্তাব দিয়েছে। এখন থেকে খেলে পরে আব কোন কষ্ট হবে না।'

'না, না ও বিষ। বিষ আমি খাব না। আর পাপ বাড়াব না আমি।'

'আঃ কেবল বাজে বকে। ভালোয় ভালোয় খেযে ফেল বলছি। না হলে—'

'কী! না হলে কী করবে শুনি? মেরে ফেলবে? তা ফেল না। নিজে মরব তবু মা হয়ে যে আসছে তাকে মাবতে পারব না। তুমি কি মানুষ! মেরে ফেল, তার চেয়ে আমাকে মেবে ফেল।'

'মালতী লক্ষ্মীটি এরকম করো না। আমি বলছি এ বিষ নয়, ওষুধ। প্রথম থেকে খেলে আর কোন কষ্ট হবে না। লক্ষ্মীটি খেয়ে ফেল।'

স্বামীর কণ্ঠের আর মেজাজের এই পরিবর্তনে অণিমা অবাক হলো।

ব্যাপারটা এতক্ষণে খানিকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। এই জন্যেই তা হলে স্বামীকে বলতে চায় না মালতী। ওর স্বামী ছেলে চায় না। কিন্তু কেন? অবনীশের খুশিভরা মুখ মনে পড়ল অণিমার।

'না, তুমি যতই বল ও ওষুধ আমি খাবনা। কিছুতেই খাবনা।'

'তুমি খাবে না তোমার ঘাড় খাবে।' স্বামীটি এবার উগ্রমূর্তি। 'তোমাদের জাতকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমার ভাল করেই জানা আছে। বেশ্যার মেয়েকে বিয়ে করতে পেরেছি আর তাকে শায়েস্তা করতে পাবব না।'

অণিমা চাবুক খেল। মালতীর চেহাবা মনে পড়ল তার। আর এই স্বল্প-দিনের ঘনিষ্ঠ আলাপ। না না তা কি করে হয়। অসম্ভব। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল অণিমার।

মালতী এতক্ষণে গর্জে উঠেছে। 'চুপ কব, ছোটলোক ইতব কোথাকার। তুমি নিজে কি? বাড়ী আর টাকার লোভে বিয়ে কবেছিলে আমাকে। মাকে দেখিয়েছিলে ভালোবাস আমাকে। আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে এসেছিলে আমার জন্যে নয়, আমার মায়ের টাকাব জন্যে। আমাকে তাবা নেয় নি, অথচ আমাব টাকাতো নিচ্ছে দুহাত ভরে। তুমি ছেলে চাও না কেন তাও জানি আমি। আমাব ছেলে তোমাদের বংশে কলঙ্ক আনবে। এমন সম্পত্তিটাও হাতছাড়া হবে। তোমার দাদার চিঠিও আছে আমাব কাছে একথাব সাক্ষী। এখন আমাকে মারতে পারলেই সব আপদ চুকে যায়। ইতব, তোমবা সব ইতর।'

অণিমা যেন স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ।

এবপরে কোন হিংস্র পশুব একটু গর্জন। কাব যেন আর্ত চীৎকাব। তাবপরে আব কিছু মনে নেই অণিমাব। হঠাৎ চোখেব সামনে একসাব হলুদ আলো জ্বলে উঠল। তারপব সব অন্ধকাব।

এর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী ফিবে ছিল অবনীশ। কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে চাকরাটাই দরজা খুলে দিয়েছিল। আর ভিতবে ঢুকেই অণিমাব অসাড় দেহ চোখে পড়ছিল অবনীশের। উপবে তখন সব চুপচাপ।

পাঁজা কোলে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে চোখেমুখে জলেব ঝাপটা দিল। একটু হাওয়া কবতেই চোখ মেলে চাইল অণিমা। অবনীশকে পাশে দেখেই সেই যে তাকে আঁকড়ে ধরল আব ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ছাড়ল না।

দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙার মত মনে হলো পরদিন সকালে। অবনীশ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই বলল, 'আমি দাদার কাছে যাব। এক্ষুণি।'

কাল রাত্তিরের ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কাব হয় নি অবনীশের কাছে। সারাটা রাত উৎকণ্ঠায় কেটেছে। কী হলো। কেন হলো। কোন আঘাত লাগে নি

তো? ভেবেছে ভোরে উঠেই অণিমাকে জিজ্ঞাসা করবে ব্যাপারটা। তারপরে ডাক্তার নিয়ে আসবে।

কিন্তু অণিমার প্রস্তাব শুনে অবাক হলো অবনীশ। বলল, 'দাদার কাছে!' কিন্তু কালকের ব্যাপারটা—। অবনীশকে শেষ করতে না দিয়েই বলল অণিমা, 'না না। তুমি এক্ষুণি গাড়ী নিয়ে এসো। আর দেরী নয়। পরে বলব সব। আমি আর একমুহূর্ত থাকতে পারছি না এখানে।'

গাড়ীতে উঠে কাল রাত্তিরের কথা যতটা সম্ভব বলল অণিমা। বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠল। অবনীশ বাঁধা দিল, 'থাক, আর বলতে হবে না। উঃ পশু। তুমি ভেবো না। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি বাসা পাল্টাব।'

কিন্তু মাস তিনেক পরে ছেলে কোলে করে অণিমাকে আবার সেই বাসাতেই ফিরতে হলো। অবনীশ চেষ্টার ত্রুটি করে নি। কিন্তু চেষ্টায় কি বাসা মেলে। ফিরবার পথেই মালতীর কথা মনে হলো অণিমার। তারপরে সেই রাত্তিরের কথা। অণিমা শিউরে উঠল। কোল থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলো ছেলেকে।

ঈশ্বরের কাছে সহস্র প্রার্থনা করেছে অণিমা মালতীর সঙ্গে যেন দেখা না হয়। মালতী যেন না আসে ওর কাছে। ওর ছেলের কাছে।

কিন্তু দুপুরেই অণিমার দরজায় ছায়া পড়ল।

তুলতুলে মাংসপিণ্ডটুকু বুকে তুলে নিয়ে স্নায়ুর সমস্ত শক্তি সংহত করল অণিমা। কিন্তু মুখ তুলে দরজায় দাঁড়ান মেয়েটিকে চিনতে কষ্ট হলো অণিমার। মাত্র তিনচার মাসে কারও চেহারার এত পরিবর্তন হয় তার জানা ছিল না। বিজয়ার সন্ধ্যায় অন্ধকার মন্দিরের ছবিটা মনে এলো অণিমার। এমনি ম্লান বিষণ্ন। শুধু ওর স্নিগ্ধ দুটি কালো চোখে সন্ধ্যাবাতির মৃদু আলো।

ধীরে এসে অণিমার পাশে বসল মালতী। হাত থেকে ছোট খানকয়েক কাঁথা রাখল খাটের ওপর। সযত্নে করা সুদৃশ্য সুচের কাজ। ছোট ছেলেদের কাঁথা কেউ এত যত্ন করে করে না। ওর মধ্যে একখানা অণিমা চিনল। ওকে দেখে একদিন লজ্জায় লুকিয়েছিল মালতী।

অস্বস্তিকর কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর মৃদু হাওয়ায় শীত করল। মালতী বলল, 'বাঃ ভারি সুন্দর ছেলে তো। একেবারে মার মত। নাও কাঁথা কখানা রেখে দাও। যদিও খোকনমণির কাছে কিছুই নয়।'

এর চেয়ে বড় সমস্যায় বুঝি কখনও পড়ে নি অণিমা। এখন সে কী বলবে। হঠাৎ বলে উঠল, 'কিন্তু তোমারও তো লাগবে। খোকনকে দিয়ে দিলেই বা

তোমার চলবে কী করে ?' যেন কিছুই হয় নি। কিছুই জানেনি অণিমা। আর সত্যিইতো কিছু জানেনি অণিমা। সেই বীভৎস রাতের দুঃস্বপ্ন ছাড়া।

'না, আমার দরকার হবে না। কেউ আসবে না আর। কেউ না আমারই ভুল। আমারই পাপ। কিন্তু আর এমন হতে দেব না, কিছুতেই না।' শেষের দিকে মালতীর কথাগুলো স্বগতোক্তির মত শোনাল। মালতীর চোখের কোণে মৃত্যুশিখা বুঝি কেঁপে উঠল।

তা হলে—অণিমার আবার সেই রাত্তিরের কথা মনে হলো। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। সব কেমন অন্ধকার মনে হলো। তাড়াতাড়ি মালতীর কোলে ছেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো অণিমা।

না, অন্ধকার নয়। জলে ঝাপসা লাগছে। আঁচল দিয়ে অণিমা চোখ মুছল।

চোরকাঁটা

এইতো মাত্র মাসখানেক হলো এসেছে ওরা। রমেন আর মল্লিকা। অথচ এরই মধ্যে শ্রী-ছাঁদ পাল্টে গেছে চার্জম্যান কলোনীর এই অনাড়ম্বর বাসাটার। অনুপম ভাবে আর অবাক হয়। নিজের বাসাকে সে যেন আর চিনতে পারে না। বারান্দার এক কোণে জড় করে রাখা গোটা চারেক চেয়ার আর একটা টেবিলকে সাজিয়ে পাতবার কথা কোনদিন মনে হয়নি তার। অথচ এখন সাজান টেবিল-চেয়ারে বসে সকাল-বিকেল চা খেতে খেতে সব কিছুকেই যেন আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়। ঘরের ধবধবে শাদা দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার আর খান-দুয়েক ছবি টাঙালে যে তার মাধুর্য এত বেড়ে যায় একথা কিন্তু একবারও ভেবে দেখেনি। তারই পরিত্যক্ত গৈরিক রঙেব লুঙ্গি কেটে সুন্দর জানালার পর্দা তৈরী হয়েছে। বাতাসে সে পর্দা পালের মত ফুলে ওঠে। আগাছার জঙ্গলে ঢাকা ছোট উঠানটাকে এখন আর চেনা যায় না। আগাছার ঝাড় বিদেয় হয়েছে। চিরকালের ফাঁকিবাজ চাকরটাই কোদাল দিয়ে কুপিয়েছে তার চার পাশ। এরই মধ্যে পাড়ার প্রায় সবার সঙ্গে ভাব হয়েছে মল্লিকার। কারও কাছ থেকে এনেছে দোপাটির চারা, কারও কাছ থেকে বা বেল ফুলের। যত্ন করে লাগিয়ে দিয়েছে উঠোনের চারধারে। মাঝখানে ছড়িয়েছে শস্য আর ডাঁটার বীজ।

আশ্চর্য মেয়ে মল্লিকা, ও বুঝি যাদু জানে।

ছুটির পরে আজকাল আব এখানে সেখানে আড্ডা মারতে যায় না অনুপম, সোজা চলে আসে বাসায়। কারখানার পোযাক ছেড়ে বাথরুমে ঢোকে। সাবান থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি জিনিস হাতের কাছে গোছান। চান করে রমেনকে ধরে এনে বারান্দায় চেয়ারে বসিয়ে দেয়। চা জলখাবার নিয়ে আসে মল্লিকা। তিনজনে বসে চা খায়, গল্প করে।

আশ্চর্য মেয়ে মল্লিকা। অনুপম ভাবে আর অবাক হয়। বিয়ের মাসখানেক পরেই পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেছে রমেনের নিম্নাঙ্গ। অচল হয়ে গেছে, অকর্মণ্য। সেও আজ তিন বছব। অথচ এক মুহূর্তের জন্যও ওকে অঙ্গহানির গ্লানি অনুভব করতে দেয়নি মল্লিকা। আগলে রেখেছে মৃন্ময় মমতায়। ঘুরে বেরিয়েছে এখান থেকে সেখানে, আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের কাছে। সমাজ আর সংসর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার ব্যথা যেন না পায় রমেন।

বিকেলে চা খেতে খেতে গল্প জমে। একথা থেকে সে কথা।

হঠাৎ অনুপম বলল, জানেন বৌদি, রমেনটা একটা কাপুরুষ।

—তার মানে? চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করল রমেন। মল্লিকার দুই চোখে কৌতুক চিক্‌চিক্‌ করছে।

—বাঃ, কাপুরুষ ন'স—তুই সর্তভঙ্গ করিসনি? মনে করে দেখতো।

—যে সর্তভঙ্গ করে সর্তের কথাটা তার মনে রাখবার কথা নয়। আর থাকলেও সে কথা স্বীকার করবার মত বোকা নন আপনার বন্ধু। কিন্তু এবার সর্তটা কি বলুন তো? চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে গুছিয়ে বসল মল্লিকা।

—তবে শুনুন। কিন্তু তার আগে বলুন সর্তভঙ্গকারীর শাস্তি কি?

—এইতো মুশকিলে ফেললেন। পিন্যালকোডের খবর আমি কি করে রাখব? তবে ঠাকুরমার মুখে শুনেছি মহাভারতে এ পাপের শাস্তি অনন্ত নরকবাস। মল্লিকার ঠোঁটে কৌতুকের হাসি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

—আর যে সর্তভঙ্গ করায়? অনুপম বলল।

—ওরে বাবা, আপনার মামলা দেখছি অত্যন্ত জটিল। মহাভারতেও নজির খুঁজে পাচ্ছি না। দয়া করে আপনিই ওদের ব্যবস্থা করুন।

—কিন্তু শাস্তি নিতে আসামীর অমত হলে চলবে না।

—তাহলেই হয়েছে। আপনাকে আর জজিয়তি করে খেতে হবে না। শাস্তি কি আসামীর ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে?

—তাহলে শুনুন, অনুপম শুরু করল, এককালে আমি আর রমেন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে কখনও ছাড়াছাড়ি হব না। যদি নেহাতই একজায়গায় চাকরী না জোটে তাহলে অবশ্য উপায় নেই। কিন্তু কথা ছিল দশ বছর চাকরী করে ছেড়ে দেব। ততদিনে যে টাকা জমবে তা দিয়ে দুজনের একটা বাড়ি হবে। একতলা, লাল টালির ছাদ, সামনে একফালি বারান্দা আর তার পরে সবুজ একটুকরো জমি। ইচ্ছে হয় তার চারপাশে ফুলের গাছ লাগাব আর সকালবিকেল চা খাব লনে টেবিল পেতে। গল্প করব দুজনে।

—কেবল দুজন?

—হ্যাঁ দুজন। ওইখানেই সর্তের অগ্নিপরীক্ষা। আর সে পরীক্ষায় ফেল করেছে রমেন।

—ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না, বলল মল্লিকা।

এতক্ষণ হাসছিল রমেন। সেদিকে চেয়ে বলল অনুপম, উঁহু হাসলে চলবে না রমেন। এবার সর্তটির কথা বল।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল রমেনের মুখ।

—তাইতো মল্লিকা ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। সর্তের এক জায়গায় ছিল আমাদের জীবনে হবে স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত। কারণ কি যেন একটা বইতে পড়েছিলাম বিয়ে করলে বন্ধুত্বে ভাঙন ধরে।

উচ্ছল হাসির অজস্রতায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল মল্লিকা।

অনুপম বাধা দিল।

—না না বৌদি, হাসি নয়। এখন বুঝতে পারছেন তুনম্বর আসামী কে? এবার শাস্তির জন্য প্রস্তুত হোন। অবশ্য রমেনের তেমন দোষ আছে বলে আমি মনে করি না। ও নিতান্তই দুর্বল পুরুষ। আমার তো মনে হয় একালে জন্মালে আপনার হাতে পড়ে ভীষ্মদেবকেও নাকাল হতে হত।

—আঃ, অনুপম বিচারকের মুখে চাটুকারিতা অশোভন। রমেনের স্বর গম্ভীর।

—না, এবার রায় দিচ্ছি। অবধান করুন, উঠোনে যে ডাঁটার বীজ ছড়িয়েছেন তা থেকে ডাঁটা হবে, সেই ডাঁটার চচ্চড়ি রেঁধে খাইয়ে তবেই এখান থেকে যাবার কথা বলতে পারবেন।

মল্লিকার সারা মুখে নির্মল কৌতুকের হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বলল, ধর্মাবতার……

কিন্তু আর বলা হল না। বাতাসে কি একটা ভারি গন্ধ ভেসে আসতেই ত্রস্তে উঠে পড়ল মল্লিকা।

—ওকি হলো? অনুপম জিজ্ঞাসা করল।

—গেল বুঝি ধোঁকার ডালনাটা পুড়ে।

কাপড় সামলাতে সামলাতে ছুটে গেল মল্লিকা। সেদিকে চেয়ে হেসে উঠল রমেন আর অনুপম।

এরকম টুকরো ছবি রোজই ফুটে উঠছে নতুন নতুন পটভূমিকায়। রঙ লেগেছে অনুপমের চোখে, রঙ লেগেছে বুঝি তার মনে। এত আনন্দ, এত সুখ কোথায় ছিল এতদিন। আকাশের রঙ পাল্টে যাচ্ছে। কি যেন আবিষ্কার করেছে অনুপম। মল্লিকা যে কোনদিন এখানে ছিল না একথা ভাবতে পারে না অনুপম। সে যে কোন দিন চলে যাবে একথা ভাবতেও কষ্ট হয়।

মল্লিকার জন্যে প্রায়ই এটাসেটা কিনে আনবে অনুপম। কোন কথা শুনবে না।

মল্লিকা বলেছিল একদিন, এ আপনার ভারি অন্যায়। আর যদি এমনি বাড়াবাড়ি করেন, তাহলে কিন্তু এখান থেকে পালাতে হবে।

যেন হোঁচট খেল অনুপম।

—হয়তো অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে গেছি আমি। কিন্তু আর ভুল হবে না। অস্বাভাবিক ভারি হয়ে এলো অনুপমের গলা।

—এই ত্যাখ, অমনি রাগ হলো তো ? আমিই বা কি বললাম আর আপনিই বা কি অর্থ করলেন তার। আপনাকে নিয়ে আর পারি না। যান এবার নিয়ে আসুন বাজার উজাড় করে যা আপনার খুশি। আমি আর কথাটি বলব না। কথার শেষে হাসল মল্লিকা। তার দুই চোখ স্নিগ্ধ। অনুপমের মুখের মেঘ কেটে গেছে।

—বেশ মনে থাকে যেন।

—মনে না থাকলেই যেন কেউ শুনছে।

—সত্যি, আপনি কোনদিন চলে যাবেন এ যেন ভাবতেই পারি না আমি।

—বাঃ, চিরকাল আপনার ঘর আগলাই আর কি! আমার যেন আর কোন কাজ নেই। তার চেয়ে ঘর আগলাবার লোক দেখলে ভালো হয় না কি।

—তার মানে আপনি বলছেন আমাকে বিয়ে করতে।

—তা করলেনই বা, ওটাইতো সংসারধর্মের সার কথা। ঋষিরা তো এই উপদেশ দিয়ে এসেছেন এতকাল।

—আমি না হয় তার ব্যতিক্রম রইলাম। তার চেয়ে এই ভাল! অনুপম বলল।

—কি ভাল ? আমি চিরকাল আপনার ঘর আগলাব আর আপনি অকৃতদার থেকে যাবেন। সত্যি, বন্ধুপত্নীর জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকারের কথা সত্যযুগেও কেউ শোনেনি।

—আপনি কি মনে করেন, অনুপম বলল, যতকিছু মহৎ কাজ সব সত্যযুগের লোকেরাই শেষ করে রেখে গেছে ?

—না তা বলছি না। তবে এযুগের লোকের পরচর্চার অভ্যাসটা বেশী কিনা, তাই তারা আপনার মহত্ত্বের অপব্যাখ্যাই করবে।

অনুপম কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মল্লিকা বাধা দিল। —যান আর কথা নয়। বয়েসই হয়েছে বুদ্ধিতে এখনও স্কুলের ছাত্র। কথা রেখে একবার ডাক্তারের কাছে ঘুরে আসুন। কাল রাত্রে যে জ্বর জ্বর হয়েছিল সেকথা এরই মধ্যে ভুলে গেলেন। এক রোগী নিয়েই অস্থির, এর পরে আর জ্বালা বাড়াবেন না দয়া করে। যান আমার এখনও অনেক কাজ বাকী।

সেদিন শনিবার। অনুপম যখন কারখানা থেকে ফিরল তখন ধোপার হিসেব মেলাচ্ছে মল্লিকা। অনুপম ঘরে ঢুকতেই বলল, বাঃ, খুব লেখাপড়া শিখেছিলেন যা হোক। দশ টাকা ধোপার হিসেবেই এক টাকা ভুল!

—কি জানেন, অঙ্কটা আমি কোনকালেই ঠিক কায়দা করে উঠতে পারিনি। ছোটবেলা পাশ করেছি রমেনের খাতা টুকে। কিন্তু হিসেবে ভুল আমার থেকেই গেল।

মল্লিকা বাধা দিল—থাক বাক্‌চাতুরী রাখুন।

তারপর অনুপমের জামার দিকে নজর পড়তেই বলল, একি, ওই নোংরা শার্টটা পরে গিয়েছিলন কেন?

—বাঃ, ধোপা যদি শার্ট দিতে দেরী করে তাহলে আমি কি করব?

—আমি কি করব—কাল সাবান দিয়ে তাহলে কাচলাম কি? আলনায় দেখতেও পেলেন না; আশ্চর্য!

অনুপম লজ্জিত হল।

—না, না এ আপনার ভারি অন্যায়। আপনি আবার মিছামিছি কেন জামা কাচতে গেলেন বলুন তো। না হয় হতই ধোপার একদিন দেরী। কারখানার কাজ আমাদের। একটু-আধটু নোংরায় কিছু এসে যায় না।

—যাক ও নিয়ে আপনাকে আর বিব্রত হতে হবে না। এবার জামা-কাপড় ছেড়ে খেতে আসুন।

শনিবার কারখানা ছুটি সাড়ে বারোটায়। জামা-কাপড় ছেড়ে খেতে এলো অনুপম। রমেন খাবার পর এসময় ঘুমোয়।

অনুপমকে ভাত দিয়ে একপাশে বসল মল্লিকা।

—দেখুন, মল্লিকা বলল, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। এবার আমরা যাই।

মুখে এক গ্রাস ভাত পুরে দিয়েছিল। সেটা চিবিয়ে ঢোঁক গিলে বলল অনুপম, তার মানে আপনার শাস্তির কথা ভুলে গেলেন এরই মধ্যে? ওই ডাঁটার চচ্চড়ি না খাইয়ে ছুটি পাচ্ছেন না।

—তার চেয়ে এক কাজ করুন না……

—একটা বিয়ে করুন এই তো? কিন্তু আমি রমেন নই। আমার প্রতিজ্ঞা অটল। মল্লিকার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল অনুপম।

—যদি আব কোন মল্লিকা মোহিনী হয়ে আসে তাহলেও না? এক মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল অনুপম।

—কিন্তু মল্লিকা দুজন হয় না। থাক আর নয় দয়া কবে এবার চুপ করুন।

শেষ দিকে কেমন বুজে এলো অনুপমেব গলা। মুখ নীচু করে ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে লাগল।

কি থেকে কি হযে গেল। কেউই বুঝি প্রস্তুত ছিল না এজন্যে। পরিচয়ের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য কেটে গিয়ে বাতাস ভারি হয়ে উঠল। মল্লিকা স্তব্ধ নির্বাক।

কিন্তু সাবধান হয়ে গেল অনুপম। নিজেকে সরিয়ে নিল জোর কবে। কাজের চাপের অজুহাতে বিকেলে চায়েব টেবিলে অনুপস্থিত হতে শুরু কবল। রমেন লক্ষ্য করল হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীব হয়ে গেছে মল্লিকা। ভাবল বুঝি একঘেয়ে লাগছে। সেদিন অনুপমকে বলল বমেন—যা ওকে নিয়ে একবাব সিনেমা থেকে ঘুরে আয়। অনেকদিন যায় না সিনেমায়। আমি তো এখন ভালই আছি।

অনুপম মল্লিকাব দিকে তাকাল। একি বিপদে ফেলল রমেন।

—চলুন না ঘুরে আসি। মল্লিকাব স্বব লঘু। যেন কিছুই হয়নি।

অনুপম অবাক হল। ভাবল মল্লিকা আশ্চর্য।

আধঘণ্টা হলে বসে থাকবাব পরই কিন্তু মাথা ধরল মল্লিকার। বলল, চলুন বাইরে যাই। উঃ মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে।

বাইবে এসে গাডী ডাকল অনুপম। কিন্তু মল্লিকা বাধা দিল। বলল, এইটুকুতো পথ, চলুন হেঁটেই যাই। হাওয়া লাগলে হয়তো মাথাটাও সেরে যাবে।

কালো পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে মল্লিকার পাশে পাশে নিঃশব্দে হেঁটে আসছিল অনুপম।

—চলুন ওই পথ দিয়ে যাই। এত ভীড় আর আলো সহ্য হচ্ছে না আমার। পাশের মাঠের মধ্যে নেমে যাওয়া সরু পায়েহাঁটা পথের দিকে আঙুল দেখাল মল্লিকা।

এ পথটা নির্জন, অন্ধকার। সন্ধ্যার পরে কেউ বড় একটা হাঁটে না। মাঝে মাঝে আশশ্যাওড়া আর ময়নাকাঁটার ঝোপে জোনাকীর থোকা। দুজনেই চুপ। কথা নেই মুখে।

এক সময় মল্লিকা নির্জনতা ভাঙল।

—আচ্ছা আপনার কি হয়েছে বলুন তো। কদিন থেকে দেখছি কেবল পালিয়েই বেড়াচ্ছেন। বন্ধুটি তো কাপুরুষ, কিন্তু আপনার পৌরুষের দৌড়ও কি এই পর্যন্ত?

অনুপম কথা বলল না। চুপ করে হাঁটতে লাগল।

—কি, কথা বলছেন না যে?

—আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

চেষ্টা করেও আর কোন কথা বেরুল না অনুপমের বুজে আসা গলা থেকে।

আপনি অন্যায়টা কি করলেন যে, ক্ষমা করতে যাব? মল্লিকার স্বর তেমনি লঘু।

—অন্যায় হয়নি, আপনি বলছেন! আমার সেদিনের অসৌজন্য—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলছি এতটুকুও অন্যায় হয়নি।

মল্লিকার স্বরে আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করল অনুপম। কিন্তু এ তিরস্কার না অভিযোগ বুঝতে পারল না।

—সবই পারেন আপনারা, কেবল পারেন না সত্যি কথাটাকে মুখ ফুটে বলতে। কেন অযথা এই মিথ্যার আড়াল তৈরী করছেন বলুন তো? কান্নায় বুজে এলো মল্লিকার গলা।

এই অন্ধকারেও, অনুপম বুঝতে পারছে, মল্লিকার ঘনপক্ষ্ম গভীর দুটো চোখ থেকে মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রু ঝরে পড়ছে।

অনুপম ডাকল—মল্লিকা।

কিন্তু মল্লিকা বুঝি তখনও কাঁদছে।

—মল্লিকা, অনুপম বলল, চল আমরা রমেনকে সব খুলে বলি। ওকে এভাবে ঠকাতে পারব না আমি।

—না, না তা হয় না। সে অসম্ভব। প্রায় আর্তনাদের মত শোনাল মল্লিকার কথাগুলো। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

তারপরে আর কথা নেই। কেবল ঝোপেঝাড়ে ঝিঁঝিঁর একটানা চীৎকার।

মল্লিকার একখানা হাত কখন অনুপমের হাতের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

মাঠ ছাড়িয়ে বড় রাস্তার আলোতে এসে খেয়াল হলো। হাত ছাড়িয়ে নিল মল্লিকা।

রমেন কথা পাড়ল—এবার আমরা যাই অনুপম। মল্লিকার বুঝি আর এখানে ভালো লাগছে না। বলছিল কাল সকালের ট্রেনেই—

—সেকি, কালই! কই আমি তো কিছু জানি না।

কিন্তু বলেই অপ্রতিভ হলো অনুপম।

—হ্যাঁ, ওব যখন ইচ্ছা আর বাধা দিসনে। একটু থামল রমেন। তারপরে বলল—ওঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ অনুপম। কি না করেছে ও আমার জন্যে। সত্যি, এক এক সময় মনে হয় কি জানিস, এব চেয়ে মরে গেলে বুঝি ছিল ভাল। নিজেকে এত ছোট মনে হয় ওর কাছে, এত কুণ্ঠিত। ভাবি ওর কাছ থেকে এতখানি নেবার অধিকার নেই আমার। এ অন্যায। কী আছে আমার কী দিতে পারব ওকে!

নিশ্বাস ফেলল রমেন।

পরের দিন বমেন আর মল্লিকাকে গাড়ীতে তুলে দিল অনুপম। একটা বেঞ্চে বিছানা পেতে শুইয়ে দিল বমেনকে। ওদিকে ঘণ্টা পড়েছে। অনুপম উঠে দাঁড়াল। বলল—যাই বমেন, মন খারাপ লাগলে চলে আসিস আমাব এখানে। আসবেন কিন্তু, বলল মল্লিকাকে।

—আসব। কিন্তু শোন অনুপম, আর নয় এবাব বিয়ে কব। নিজেকে অকুণ্ঠ বিশ্বাসে আর কাবও হাতে তুলে দিয়ে যে কি স্বস্তি সে আমি মল্লিকাকে দিয়ে বুঝেছি। আমার কথা শোন ঠকবি না।

কথা শেষ করে সস্নেহ দৃষ্টিতে মল্লিকার দিকে তাকাল রমেন। মল্লিকার মুখ লাল। মুখ নীচু করে শাড়িব আঁচল আঙুলে জড়াচ্ছে।

ততক্ষণে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। হাতল ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে পা রাখল অনুপম।

—মনে রাখিস আমাব কথাটা, ঠকবি না—কর্কশ হুইসিলের আওয়াজে রমেনের কথার শেষ অংশ ঢাকা পড়ে গেল।

প্রণতিদি, ও প্রণতিদি—বাঁশের কেয়ারি ঠেলে পাশের বাড়ির রেখা উঠোনে ঢুকল।

লণ্ঠনের আলোয় বসে উল বুনছিল প্রণতি। চোখ না তুলেই বলল, কী হলো?

—কী হলো? আচ্ছা লোক তুমি বাপু, গোটা কলোনীর লোক জেনে গেল, আর তোমার কানেই পৌঁছুলো না খবরটা।

—কী খবর রেখা? প্রণতির কণ্ঠে আশানুরূপ কৌতূহল প্রকাশ পেল না যেন।

সুরেন রায়ের দল হেরে গেছে। সবাই মিলে সোমেনদাকে কলোনীর সেক্রেটারী করেছে। সোমেনদা নাকি কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। সবাই মিলে একরকম জোর করেই করেছে। এখন কী খাওয়াবে বলতো?

কিন্তু তবুও প্রণতির চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক খেলল না। আরও একটু থমথমে হলো।

বিস্মিত হলো রেখা। এতদিন পাশাপাশি থেকেও এই মেয়েটিকে চেনা গেল না। যেটুকু ওর বাইরে, সেটুকু নম্র, শিষ্ট। কিন্তু তার ওদিকে, মনের রাজ্যে, কারও প্রবেশের অধিকার নেই। সে রাজ্য গভীর, অন্ধকার।

প্রণতি ততক্ষণে আবার উল আর কাঁটায় মন দিয়েছে। যেন কিছুই হয় নি। এই সব মুহূর্তে প্রণতির অস্তিত্ব বড় অস্বস্তিকর লাগে রেখার কাছে। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। আর প্রণতিকে নির্মম।

—আচ্ছা এখন যাই, ছেলেটা হয়তো আবার কান্নাকাটি শুরু করেছে।

রেখা চলে গেল। অস্বস্তির হাত এড়াতেই হয়তো। আর রেখা চলে যেতে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল প্রণতির। সোমেন কলোনির সেক্রেটারী হয়েছে, অথচ তাঁর স্ত্রী হয়ে প্রণতি খুশি হতে পারছে না। ছোট-বড় শ-পাঁচেক ঘর নিয়ে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের এই কলোনীর যে কোন বধূই আজ প্রণতিকে ঈর্ষা করতে পারে। এই ক্ষুদ্র উপনিবেশের ভাগ্যবিধাতাই বলা চলে সোমেনকে। সবাই তাঁকে বিশ্বাস করে, ভালবাসে। আর তাইতো জোচ্চোর সুরেন রায়কে তাড়িয়ে সোমেনকে সেক্রেটারী করেছে।

কিন্তু প্রণতি তবু খুশি হতে পারল না। সোমেন যে শেষে এদেরই একজন হবে একথা জানলে এখানে সে কিছুতেই আসত না। সোমেন এদের মধ্যে থাকুক, এদের দেখুক, চিনুক, জানুক এদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের কথা, তাঁর সামনে নতুন অভিজ্ঞতার দরজা খুলে যাক, আর নতুন আলোয় বেঁচে উঠুক শিল্পী সোমেন এইটুকুই শুধু চেয়েছিল প্রণতি। তাইতো আনন্দনগর কলোনীর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হয়ে এখানে আসা। মানে সোমেনকে নিয়ে আসা। না হলে ঠিক উদ্বাস্তু বলতে যা বোঝায় প্রণতিরা তা নয়। পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল এই পর্যন্ত। কালেভদ্রে যেত। আর বিশেষ কিছু ছিলও না সেখানে। সরকারী চাকরী নিয়ে মফঃস্বলে ঘুরেছে অনেকদিন। প্রণতিই চেষ্টা করে বলে-কয়ে সোমেনকে দিয়ে কলকাতায় বদলির চেষ্টা করিয়েছে। প্রণতির আশা ছিল পুরনো বন্ধুদের সাহচর্যের উত্তাপে নিজের মনের স্থবির মেদ গলিয়ে নিতে পারবে সোমেন। হয়তো আবার লিখতে সুরু করবে। প্রণতির আশা ছিল। এই আশা নিয়েই বেঁচে ছিল প্রণতি। কিন্তু সে বিশ্বাসের নটে গাছ এবার বুঝি মুড়োল। কেউ যেন ভেংচি কাটল প্রণতির আকাঙ্ক্ষাকে।

সোমেন প্রথম কথা বলল বিছানায় শুয়ে।

আজ একটা কাণ্ড হয়েছে।

প্রণতি পাশ ফিরে বলল, হুঁ।

যতীশবাবুরা সবাই মিলে একরকম জোর করেই আমাকে কলোনী কমিটির সেক্রেটারী করে দিলেন। আমার একদম ইচ্ছে ছিল না এই ঝামেলায় জড়াবার। কিন্তু ওরা—একি, কী হলো তোমার, এরই মধ্যে ঘুমুলে নাকি? সোমেন প্রণতির গায়ে হাত রাখল।

—হ্যাঁ, বড্ড ঘুম পাচ্ছে। হাই তুলল প্রণতি।

অথচ সোমেনই আগে ঘুমুল। প্রণতির চোখে ঘুম এলো না। ভীড় করে এলো পুরনো ছবি। একের পর আর। জানালার কাঁচে রোদ লাগল যেন।

বছর দশেক আগে ছোট বোন মিনতির প্রাইভেট টিউটররূপে যে সোমেনকে সে প্রথম দেখেছিল, তার সঙ্গে এখন, তার পাশে ঘুমিয়ে-পড়া খুশি-মুখ লোকটির কোন সাদৃশ্য নেই। তবু কখনও কখনও সেই দুটি আশ্চর্য চোখে আলো জ্বলে। কিন্তু সে কেবল দু'এক মুহূর্তের প্রজ্বলন। তারপর আবার ক্লান্তি। আবার নির্বাপণ। কেন এমন হলো! প্রণতি নিজের মনে উত্তর হাতড়ায়।

ম্যাট্রিকুলেশনের সার্টিফিকেট আঁচলে বেঁধে বসেছিল প্রণতি। বিবাহ-

লোকের প্রাথমিক ছাড়পত্র। ঘরে-বাইরে প্রস্তুতি চলছে। এমন রবিবার বাদ যায় নি, যেদিন দু-চারজন লোক ধরে আনেন নি বাবা। তাদের হাজারো প্রশ্নের জবাব। বিহুনি দেখে বরের জ্যাঠা মুখ কোঁচকালে পরের দিন লোটন খোঁপা। প্রণতি চৌধুরী নাম শুনে ছেলের পিসেমশাই আধুনিকতার উপর কটাক্ষ করলে পরের দিন শ্রীমতী প্রণতি দেবী। সেদিন হয়তো আপত্তি করেছে ছেলের বন্ধু। প্রণতি মনে মনে প্রার্থনা করেছে শনিবারের রাত্রি দীর্ঘতর হোক। কিন্তু এক সময় রাত কেটেছে। সকাল গড়িয়ে সেই বিকেল। কিন্তু সেদিন বিকেলে আর তাকে কেউ দেখতে এলো না। বরং তাদের বাড়িতে যে এলো এক সময় দরজার ফাঁক দিয়ে তাকেই এক নজর দেখে এলো প্রণতি। কালো, হ্যাঁ তা কালো বৈকি গায়েব রঙ। মাথায় একরাশ চুল উল্টো করে আঁচড়ান। আর মাঝারী কালো দুটি চোখ। তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল। এই হলো সোমেন রায়। প্রণতির ছোটবোন মিনতির গৃহশিক্ষক হবার আর্জি নিয়ে এসেছে। বাবার এক বন্ধুর চিঠি নিয়ে এসেছিল। বাবা আলাপ করে খুশি হলেন।

কাজে বহাল হলো সোমেন।

প্রণতির মনে হলো নামটা যেন তার চেনা। কিন্তু কোথায় আর কেমন করে এইটুকুই মনে পড়ছে না।

মনে পড়ল আরও কয়েকদিন পরে। কোন বন্ধুর কাছ থেকে একখানা মাসিক পত্র পড়তে এনে। নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে সে কাগজের কৌলীন্য সম্বন্ধে তখনকার দিনে দ্বিমত ছিল না। সূচীপত্রে সাক্ষাৎ মিলল সোমেন রায়ের। একটা গল্প ছিল। প্রণতির মনে পড়ল এঁর গল্প সে তো আরও পড়েছে। আর তাই মিনতির মাষ্টারমশাইএর নাম চেনা মনে হচ্ছিল। প্রথমেই সোমেনের গল্প পড়ল প্রণতি। সে গল্পও আজ তার মনে নেই। তবে আর এক গল্পের সূত্রপাত সেই থেকে। আর এর লেখক সোমেন নয়। প্রণতি চৌধুরী। এখন তো রায়। সে গল্প তার ভালো লেগেছিল। আর ভালো লেগেছিল কালো লাজুক একটি মানুষের উজ্জ্বল দুটি চোখ। অবশ্য প্রণতি তখনও জানেনি মিনতির মাস্টার মশাই এই সোমেন রায়। কিন্তু মন বলছিল না হয়েই যায় না। প্রণতির তখন বয়স কম। কৈশোর ছল ছল চোখে পিছনে দাঁড়িয়ে। যৌবন দেহমনে স্পর্শ দিয়েছে। ষোলর দরজা বন্ধ, সতের সিঁড়ি ভাঙছে। হিসেবী আঠার তখনও আঁটঘাট বাঁধে নি। ও বয়েসটাই এমনি। সোমেনের আর কোন পরিচয় নেই প্রণতির কাছে। সে শিল্পী।

যে রোজ সন্ধ্যায় তাদের বাইরের ঘরে বসে মিনতিকে বায়ুর চাপমাত্রা থেকে শুরু করে ভিটামিন 'বি'র প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ঝাড়া দু-ঘণ্টা জ্ঞান দান করে। প্রণতির জানতে ইচ্ছে করে এরকম আরও কজন ছাত্র-ছাত্রী আছে সোমেনের। আর তাদের সবারই কি মিনতির মত নিরেট মাথা। আচ্ছা লোকগুলো ট্যুইশান করে কী করে? মাথা গরম হয়ে ওঠে না, মেজাজ খিঁচড়ে যায় না?

মাস তিনেক আরও কাটল। সোমেন আসে মিনতিকে পড়ায়। আর প্রণতি মাঝে মাঝে দেখে সেই আশ্চর্য দুটি চোখ। স্বচ্ছ, স্বপ্নিল। আচ্ছা, প্রণতি ভেবেছে, যদি কখনও এ স্বপ্ন ভাঙ্গে, তাহলেও কি ওর চোখ তেমনি উজ্জ্বল থাকবে? কে জানে!

সেদিন সোমেনের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ জুটে গেল আশাতীতভাবে। শিলং থেকে বড় মাসীমা এসেছিলেন কলকাতায়। দুপুরে মাকে ধরে নিয়ে গেলেন বেলেঘাটা। তাঁর শ্বশুরবাড়ি। মিনতিও সঙ্গ নিল। প্রণতির যাওয়া হলো না বাবার জন্য। বাবা অফিস থেকে ফিরলে তাঁকে খাবার দিতে হবে। চা করতে হবে।

সোমেন এলো ছ'টাব সময়। বাবা তখনও ফেরেন নি। ঝি-টা গিয়েছে বাইরে। প্রণতিকেই দরজা খুলে দিতে হলো। বলল, বসুন, মিনতি মার সঙ্গে বাইরে গেছে, ফিরতে হয়তো দেরী হবে।

একটু পবে. চা নিয়ে এলো প্রণতি ভীষণ লজ্জা করছিল সোমেনের। মুখ তুলতে পারছিল না। প্রণতি বলল, নিন চা খান। বাবা বোধ হয় এক্ষুণি এসে পড়বেন। কেন যে বাবার আসবার কথা বলল, তা নিজেই বুঝতে পারছিল না।

প্রণতির হাত থেকে চায়ের কাপ নিল সোমেন। হাত কেঁপে গিয়ে খানিকটা চা চলকে পড়ল ডিসে। মুখ নীচু করে চুমুক দিল কাপে। আর প্রণতি দেখছিল তার সেই চোখ। স্বচ্ছ আর স্বপ্নালু। এমন সময় দরজায় কড়া নড়ল। বাবা এলেন। আর সেই পরিস্থিতিটা প্রথম অনুধাবন করল প্রণতি। লজ্জা হলো তার। ভীষণ লজ্জা। নিজের আদেখলেপনার জন্য। কী দরকার ছিল তার সোমেনকে নিজ হাতে চা করে খাওয়াবার।

প্রণতি দরজা খুলে দিল। বাবা ঘরে ঢুকলেন। সোমেনকে দেখে বললেন, এই যে মাস্টারমশাই এসে গেছেন। তা আপনার ছাত্রী কোথায়?

মাস্টারমশাইএর হয়ে উত্তর দিল প্রণতি। মা আর মিনতিকে মাসীমা বেলেঘাটা নিয়ে গেছেন।

'ও, তা বেশ, ভালই হলো। আসুন একটা সন্ধ্যা গল্প করে কাটাই। ছাত্রী তো রোজই আছে। আর বুঝি তো মশাই, সবই প্রয়োজনের জন্যে। রোজ রোজ কি আর পড়াতে ভালো লাগে। আমাকেও একবার মাস তিনেক ছাত্র পড়াতে হয়েছিল। ও সে অভিজ্ঞতার কথা আর ভুলব না। যাক্, যা তো মা, আমার চা'টাও এখানে নিয়ে আয়। আমি হাত মুখটা ধুয়ে আসি।

মিনতিরা ফিরল রাত সাড়ে নটায়। তখনও পর্যন্ত সোমেনকে ধরে রেখে-ছিলেন বাবা। গল্প আর গল্প। প্রণতি নীরব শ্রোতা। কথার মাঝে হঠাৎ হয়তো প্রণতিকে জিজ্ঞাসা করেছে সোমেন, আপনি কী বলেন? প্রণতি বিব্রত হয়েছে। ভালোও লেগেছে তার। সোমেনের প্রতিটি কথা গিলেছে প্রণতি।

এরপর থেকে সন্ধ্যার দিকে সোমেনের চা-টা প্রণতিই নিয়ে আসত। কী করে যে ব্যবস্থাটা চালু হয়ে গেল কে জানে। বলা বাহুল্য চায়ের কাপ নিয়ে ফিরতে প্রায়ই দেরী হতো। আর হাঁফ ছেড়ে সে সময়টা বাঁচত মিনতি। দেখা গেল, আগ্রহটা ছাত্রীর চেয়ে তার দিদিরই বেশী। আর সোমেনও মিনতিকে পড়িয়ে যেন তেমন আনন্দ পাচ্ছে না।

ব্যবস্থাটাকে পাকা করে দিলেন বাবা। প্রণতির বিবাহ-প্রচেষ্টার ভরা জোয়ারে তখন ভাঁটা পড়েছে। এদিকে কলেজে ভর্তি হবার সময়ও নেই আর। অথচ পড়াশুনোয় ঝোঁক ছিল প্রণতির। বাবা বললেন, বরং বাড়িতে বসেই পড়াশুনো কর। আমি না হয় সোমেনকে বলে দেব, তোকেও একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

কথাটা ঠিক মনঃপুত হলো না প্রণতির। বলল, কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—ওর সঙ্গে তো কথা ছিল কেবল মিনতিকে পড়াবার। এখন আবার—

তাকে বাধা দিয়ে বাবা বললেন, সে কথা আর আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না রে। আর কিছু টাকা বাড়িয়ে দেব।

কিন্তু মুশকিল হলো সোমেনকে নিয়ে। বাড়তি দায়িত্ব নিতে সাগ্রহে রাজী হলো। আপত্তি দেখা গেল বাড়তি টাকা নিতে। বলল, এতো ভাল কথা, মিনতির সঙ্গে বসে পড়বে ওতে আমার আর তেমন বেশী খাটনি তো হচ্ছে না কিছু।

এর মাস ছয়েক পরে সোমেনের চাহিদা প্রণতির বয়ে আনা পানীয় থেকে পাণিতে পৌছলো। আর প্রণতির বাবার তাতে মানহানি। শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোক হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তিনি সম্রাট। একটি মেয়ের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সোমেনকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে পিছনে দরজা বন্ধ করলেন। কিন্তু হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল তাঁর। বাইরে থেকে ভিতরে আসবার রাস্তা বন্ধ করলেন কিন্তু ভিতর থেকে বাইরে যাওয়া যে তাতে আটকায় না সে কথা মাথায় আসেনি তাঁর। সেই পথেই বাইরে এলো প্রণতি। দিন চারেক পরে বাবাকে চিঠি দিল রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছে সে আর সোমেন। আত্মীয় স্বজন বুদ্ধি দিয়েছিল, মামলা করতে। প্রণতির বয়েস একুশ হয়নি। অতএব এ বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়। কিন্তু বাবা রাজী হননি।

সোমেনের জীবিকা ছিল গোটা দুয়েক ট্যুইশান। তারও একটা গেল। বিয়ের প্রণামী। এবার চাকরি চাই। আরও একটা ট্যুইশান। ট্যুইশান মিলল, কিন্তু চাকরি দুর্লভ। প্রেমের চেয়েও। অবশেষে অনেক হেঁটে, অনেক খেটে চাকরি মিলল। কিন্তু মাইনে যা তাতে ট্যুইশানও একটা রাখতে হবে। এই করে চলল এক বছর। আর এক বছরেই দেখা গেল সোমেনের চোখের লাল জমিন কেমন ফিকে হয়েছে। স্বপ্নিল চোখে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। আর এক বছরে একদিনও সোমেন কাগজ-কলম ছুঁতে পারেনি। সে যে কোনদিন লিখত একথাও বুঝি তাকে মনে করে দিতে হয়।

সোমেন ভুলেছে। কিন্তু প্রণতি ভুলতে পারছে না। সূর্য ডুবলে যে-মেঘে রঙ জড়িয়ে থাকে প্রণতি সেই মেঘ। সোমেনের অতীতের শিলালিপি। সোমেন যে আর লিখছে না, লিখতে পারছে না এ যেন প্রণতিরই লজ্জা। তারই পরাজয়। যে ছিল শিল্পী, সে হলো সংসারী। অথচ উল্টোটি চেয়েছিল প্রণতি। সংসারের সব দায়িত্ব নিয়ে সোমেনকে অবকাশ দেবে প্রণতি। শিল্পী সোমেনকে। কিন্তু হলো না। আশা ছাড়েনি প্রণতি। প্রথম প্রথম বলত তুমি আর লিখছ না কেন বলতো? সোমেন বলত, লিখব, লিখব, দাঁড়াও না। এখন তো কেবল জানবার সময়। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের। এতদিন যা লিখেছি সে সব তো মেকি, ব্যসন। এবার আবার নতুন করে লিখতে শুরু করব। নতুন কথা।

সোমেনের চোখে তখনও আলো ছিল। সেই আলো।

এর পর মফঃস্বলে বদলি হলো সোমেন। এ শহর থেকে সে শহর। কাটল

বছর সাতেক। দুজনেব সংসাবে আবও তিনজনের জায়গা কবে দিতে হয়েছে। সোমেনকে দেখে মনে হবে না এতটুকু অভিযোগ আছে তাঁব জীবনেব বিরুদ্ধে। সব কিছুকেই সহজভাবে মেনে নিতে পাবছে। স্বচ্ছন্দে। কিন্তু মেনে নিতে পারেনি প্রণতি। সোমেন যে কোনদিন লিখত, লিখতে পাবত, সোমেন ভুললেও প্রণতি তা ভুলতে পাবেনি। সোমেনেব জন্য নয়, নিজের জন্যই পাবেনি। তাই নিজেব স্বাস্থ্যেব অজুহাতে সোমেনকে যখন কলকাতা বদলিব চেষ্টা করতে অনুবোধ করল, মনে তার ছিল অন্য আশা। প্রণতিব আশা ছিল কলকাতা এলে পুবনো সাহিত্যিক বন্ধুদেব সঙ্গে আবাব দেখা হবে। সোমেনের সঙ্গে একই সময়ে লিখতে শুরু কবেছিল তাঁবা। আজ তাঁদেব অনেকেই মোটামুটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সোমেনই শুধু হারিয়ে গেছে। খাবিজ খাতায় অঙ্ক বাড়িয়েছে। আব প্রণতিব ধাবণা বুঝি সে-ই দাযী এজন্য।

অনেক চেষ্টায বদলির আবেদন মঞ্জুব হলো। কিন্তু বাসা কোথায় কলকাতায ?

প্রণতি বলল, এখন বাবার ওখানেই উঠব। পরে খুঁজে নেওয়া যাবে। বাবাব সঙ্গে সম্পর্কেব খাঁডিতে ততদিনে পলি পড়েছে।

কিন্তু শুধু চাকবিব টাকায় কলকাতায় সংসাব চলে না। অন্ততঃ স্বচ্ছন্দে নয়। অতএব আবাব সেই ট্যুইশান। প্রমাদ গণল প্রণতি। একটা অভাবের অক্টোপাশ তঁব ক্লেদাক্ত বাহু দিযে সোমেনকে জডিয়ে ধবেছে। না সোমেনকে না, প্রণতিব সেই কল্পনাব শিল্পীকে। প্রণতিব বিশ্বাস, আজও, এতদিন পবেও তাঁকে বাঁচান যায। আর এ বিশ্বাস নষ্ট হলে প্রণতিব নিজেব বাঁচাও বুঝি নিরর্থক। এখনও প্রণতি সোমেনেব কালিপডা ম্লান দুটো চোখের তাবায় সাত বছব আগেব আলো খুঁজে বেডায।

হঠাৎ সুযোগ এলো। শহব বলকাতাব আশেপাশে অসংখ্য বসতি গড়ে তুলেছে পূর্ববঙ্গেব উদ্বাস্তবা। বানচাল জীবনতবী মেবামত কবে আবাব ভাসাবার চেষ্টা চলছে। এরই এক কলোনীতে মেয়েদের এম ই স্কুলেব শিক্ষয়িত্রীর চাকরি জুটে গেল প্রণতিব। যোগাড কবল। শুধু চাকরি নয, কলোনিতে জায়গাও পাবে তাবা। ঘব তুলে নিতে হবে নিজেদেব। কলোনিব কর্তৃপক্ষদের বলেছিল প্রণতি, কিন্তু আমরা তো আপনাদেব মত সব খুইয়ে আসিনি। আমাদের জায়গা দিলে হয়তো আপনাদেব মধ্যেই অনেক কথা হবে।

—কিন্তু খুইযে যেমন আসেননি, তেমনি ফিরে গিয়ে ভোগদখলও তো আর

—তারপর নতুন আর কি লিখলেন আপনি? গত মাসের পত্রপুটে গল্প পড়লাম আপনার। চমৎকার লাগল।

একটু বিব্রত বোধ করল অনিরুদ্ধ। ওই কি এক স্বভাব। লেখার প্রশংসা শুনলেই বিব্রত বোধ করে। হেসে উড়িয়ে দিলে লোকে বলে বিনয়। আর বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলে বলে দেমাক।

—গল্প ভালো হয়েছে, বলল প্রণতি, কিন্তু আপনার বক্তব্য ভালো লাগেনি আমার। আপনার গল্পের নায়ক প্রভাকর শিল্পী। অথচ অর্থের জন্যে নিজেকে বিক্রী করে দিতে তার একটুও বাধল না। হয়তো এ অসম্ভব নয়। কিন্তু সম্ভব বলেই কি তা সুন্দর। প্রথমে যাকে অত সুন্দর করে এঁকেছেন শিল্পীর মহিমা দিয়েছেন অন্ততঃ তাঁর কাছ থেকে এই অর্থলালসা আশা করিনি।

অনিরুদ্ধ শুনছিল আর অবাক হচ্ছিল। পাঠক হিসেবে সাধারণত মেয়েদের ওপর তার বিশেষ আস্থা কোনকালেই ছিল না। তার ধারণা ছিল ওঁরা কেবল গল্প পেলেই খুশি। আর সে-গল্প যদি হয় মিলনান্তক। প্রণতির মত মেয়ের সঙ্গে তার আগে পরিচয় হয়নি। এ শুধু গল্প পড়ে না, তা নিয়ে ভাবে।

অনিরুদ্ধ বলল, আপনি যা বললেন, সে হচ্ছে আদর্শের কথা। অথবা সেন্টিমেন্টের। কিন্তু যা হয়, হতে পাবে তাই নিয়েই তো সাহিত্য।

—হতে পারে, কিন্তু নাও হতে পারে। আব লিখতে না পারলে অথবা লেখা ছেড়ে দিলেই কিছু শিল্পীর মৃত্যু হয় না। অনুভূতির রাজ্যে তাঁর সৃষ্টির কামাই নেই। এই অনুভূতি যদি বেঁচে থাকে তাহলে যে কোনদিনই আবার সে সৃষ্টিশীল হতে পারে। কথাটা নিজের কানেই কেমন বেখাপ্পা শোনাল প্রণতির। অসংলগ্ন, অবান্তর। অথচ এই অবান্তর কথাগুলোই এত জোর দিয়ে বলল, যেন নিজের বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করছে।

অনিরুদ্ধ অবাক। বলল, দেখুন, সাহিত্য তো অঙ্ক নয়। দুয়ে আর দুয়ে চার এখানে নাও হতে পারে। এই না-হতে-পারার রাজ্যই শিল্প আর সাহিত্যের। না-কেই হ্যাঁ করে তোলা, অথবা হ্যাঁ-কে না। অঙ্ক দিয়ে নয়, অনুভূতি দিয়ে। রং-তুলি অথবা ভাষার মাধ্যমে।

—কিন্তু তাই বলে—

—না এ নিয়ে আর কথা নয়। প্রণতির মুখে কথার হাত চাপা দিল অনিরুদ্ধ। শিল্প মরুক, মরুক সাহিত্য, ও নিয়ে কোমর বেঁধে জোট পাকাক ডক্টরেট সমালোচকরা। আমাদের ছুটির দিনটা এমনি করে নাইবা নষ্ট করলাম।

আর সোমেনের কাণ্ডটাও দেখুন একবার। ওকি মিটিং-এ যাবার আর দিন পেল না?

—ওই তো করছে দিনরাত। কমিটি আর মিটিং। কী যে আনন্দ আছে ওর মধ্যে জানি না। বরং একটু সময় করে যদি লিখতে বসত।

হোঁচট খেল অনিরুদ্ধ। প্রণতির গলায় আক্ষেপের সুর।

দিন কাটল গানের একটা কলির মত। গল্প করে আড্ডা দিয়ে। যেন আগের সেই দিনগুলো। সোমেনের বিয়ের পরের। অনিরুদ্ধ যখন তাদের নিত্যসাথী। স্বপ্ন আর উদ্দামতার দিন। ক্যালেণ্ডারের পাতায় সবগুলো লাল তারিখ। বহুদিন পরে সোমেনের চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল প্রণতি। সেই সোমেন, যে আট বছর আগে তাঁর চোখে মোহ এনেছিল। তাঁর চোখের কোণের লাল দাগগুলো, যা প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে এসেছিল, আবার যেন রঙ ফিরে পেয়েছে। ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রণতির বুক উত্তাল হয়ে উঠল। বহুদিন পরে।

বিকেলে অনিরুদ্ধকে নিয়ে বেরোল সোমেন। কলোনিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাল। পুকুরপারের ঘাটলায় বসে কাটিয়ে দিল নির্বাক সময়।

রাত্তিরে খাবার পরে আবার ট্রেন। প্রণতি অনুরোধ করল, আবার আসবেন। ছুটি পেলেই আসবেন। প্রত্যেকবারেই নিমন্ত্রণ করে আনতে হবে এমন কোন কথা নেই।

প্রণতির কথায় আন্তরিকতার গভীর সুরটুকু অনিরুদ্ধকে স্পর্শ করল।

অনিরুদ্ধকে ট্রেনে তুলে দিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ফিরল সোমেন। ততক্ষণে হেঁসেলের কাজ চুকিয়ে ফেলেছে প্রণতি। ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়েছে। তেল-হলুদ-মাখা ময়লা কাপড়টা ছেড়ে ফেলে পরেছে একখানা ফর্সা শাড়ি। এরই মধ্যে মাথায় একবার চিরুণী বুলিয়েছে। টেবিলের ওপর স্টীলের ফ্রেমে দুটো ফটো। সোমেন আর প্রণতির। বিয়ের আগে তোলা। প্রণতির মনে আছে সবচেয়ে ভালো হয়েছিল বলে এই ফটোরই কপি পাত্রপক্ষের কাছে পাঠান হতো। এই প্রিণ্ট থেকেই একখানা চুরি করে সোমেনকে দিয়েছিল প্রণতি। ফটোখানা আঁচল দিয়ে মুছল। সস্নেহে। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সোমেনের ফটোর দিকে। তাঁর নাতিদীর্ঘ উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে। কি মোহ ছিল সেই চোখে।

পিছনে শব্দ হলো। দুয়োরে দাঁড়িয়ে সোমেন। প্রণতির দিকে চেয়ে

হাসছে। আর তার চোখে, এতদিন পরে, আবার সেই হাসি। সেই আলো। প্রণতির বুকে হাজার ঢেউ উত্তাল হলো। এবার বুঝি সে নিজেও ভেঙে পড়বে।

কিন্তু তার আগেই সোমেন তাকে ঘিরে ফেলেছে। তাঁর বাহু দিয়ে। তাঁর চোখ দিয়ে।

কয়েকটি নির্বাক মুহূর্ত। প্রণতিকে খাটের ওপর বসিয়ে দিল সোমেন। জান, সোমেন বলল, ভাবছি আবার লিখতে শুরু করব। একেবারে ছেড়ে দেবার কোন মানেই হয় না।

কলার পাতায় যেন বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনছে প্রণতি। কুয়াশায় ঢাকা অপরিচিত আবছা মুখ আবার স্পষ্ট হচ্ছে।

তাছাড়া, একটু থেমে সোমেন বলতে আরম্ভ করলে, অনিরুদ্ধর কাছে শুনলাম এখন অবস্থা অনেক বদলেছে। মানে আমরা যখন প্রথম লিখতে আরম্ভ করি সে সময় থেকে। মাসে একটা গল্পও যদি লিখতে পারি, আর কিছু না হোক, কুড়িটা টাকাব আর ভুল , ই। গয়লার এক মাসের বিল, কী বলো?

কে যেন চাবুক মা.. প্রণতিকে। সোমেনের বুকেব মধ্যে প্রণতিব মমতানরম দেহটা হঠাৎ .. নাড়া খেয়ে কাঠ হয়ে গেল। সোমেনকে আঁকড়ে ধরা হাত দুখানা শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল। একবার শুধু তাকাল সোমেনেব মুখেব দিকে। কী নিরক্ত, কুৎসিত আর লোভাতুর তাব দুটো চোখ।

কী হলো তোমার? সোমেনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

—কিছু না, মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। দাঁড়াও একটু জল খেয়ে আসি। আর জল খেয়ে পাশের খাটে ছেলেমেয়েদের কাছে এসে শুয়ে পড়ল প্রণতি। বলল, মশারিটা ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়।

